সুভাষের সঙ্গে বারো বছর

(১৯১২-২৪)

(নেতাজীর প্রথম জীবন ও পত্রাবলী

এবং

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিনগুলি)

লেখক—

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

প্রকাশক
মানবেন্দ্র সরকার
সরকার এণ্ড কোং
৭বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯

মূল্য ৩৷৷০

মুদ্রাকর
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
পরিচয় প্রেস
৮বি, দীনবন্ধু লেন

উৎ

ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, এম. বি.

করকমলেষু—

দেশসেবার বন্ধুর ও অনিশ্চয় পথে সুদীর্ঘকাল ঘুরে আমার জীবন প্রদীপ যখন নিবু নিবু হয়েছিল, সেই সময়ে আপনি আপনার বন্ধুবৎসল হৃদয়ের সোনার কাঠি দিয়ে আমায় পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন—সেই পুনরুজ্জীবনের অন্যতম ফল আমার বাল্যের প্রিয়তম বন্ধু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কাহিনী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাকে উৎসর্গ করলাম।

—শ্রীহেমন্ত

অবতরণিকা

বাংলা ১৩৩৪সালের শ্রাবণ মাসে সুভাষচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করি। তাতে সুভাষচন্দ্র আমার উপর রাগ করেন, তাঁর সঙ্গে আমার যে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাতে পত্রগুলি প্রকাশ করায় অনেক কথা বের হয়ে যায়, যা তিনি পছন্দ করেন নি। সেজন্য আমার নিকট সুভাষের আরও শতাধিক পত্র থাকলেও আমি ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বা অন্যান্য পত্র-গুলির প্রকাশ থেকে এতদিন বিরত ছিলাম। সুভাষের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় থেকে বহু পুস্তক ও পুস্তিকা সুভাষের কার্য্যকলাপ ও জীবনী সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। এইগুলি পড়ে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি—দেখলাম অনেক ভুল কথাও প্রচার হচ্ছে। উত্তম চাঁদের কাহিনী যেমন নেতাজীর পরিণত জীবনের একটি অধ্যায়ের উদ্ঘাটন করেছে, তেমনি কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মনোভাব ও অনেক কথা আমার এই পুস্তক থেকে বিস্তৃতভাবে জানা যাবে। তাতে দেখা যাবে, সুভাষ সাধারণ মানুষের মত জন্মান নি, তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন এবং গোড়া থেকেই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করেছিলেন। এক একটি প্রধান ঘটনা কেবল সেই মহৎজীবনের মধ্য দিয়ে যে যোগসূত্র ছিল তাতেই ফুলের মত গাঁথা ছিল। কালের ব্যতিক্রমে নানারূপে সেগুলি প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। সুভাষচরিত্র কিভাবে ক্রমবিকাশের পথে চলেছিল তার নিজের লিখিত পত্রাবলী এই সূত্রের সন্ধান দিবে।

আমার নিকট লেখা সুভাষের পত্রগুলিতে এমন অনেক কথা আছে, যেটা প্রকাশ হ'লে আমার আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা হয়, তাই ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে "জনৈক বন্ধু" বলেই নিজকে চালিয়ে দিয়েছিলেম। আত্মপ্রচারের লোভ নেই ব'লে আমি এগুলি প্রকাশ করতে আজও অত্যন্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করছি। তবে এইটুকু মনে করে আমার ক্ষুদ্র জীবনের সান্ত্বনা এই যে এত বড় জীবন গঠনে আমার দান কিছু ছিল! আমি গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছি, সমুদ্র মন্থনে যে লক্ষ্মী উঠেছে, তা সুভাষ পেয়েছে। বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলি—'হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিনু কাঁদিতে জনম গেল।' কৈশোর ও প্রথম যৌবনের আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধটা যেন একটা রোমান্সের মত ছিল।

প্রথম সুভাষ চেয়েছিল আমার কাছে, আমি সাধ্যমত দান করেছিলাম, তারপর সে পাওয়ার বিভোরতায় পূর্ণ হয়েছিল এবং তারপর আসে তার দেওয়ার পালা। সে আমার মত না দিয়ে সামান্য খুঁটিনাটি কাজেও হাত দিত না—কেবল কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ আমার মতের বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছিল। তার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত ভালবাসার অভাব শেষ পর্য্যন্ত হয়নি!

সৈনিক সুভাষকেই সকলে বড় করে দেখেছেন কিন্তু তার চেয়েও বড় এক সুভাষ ছিল, তারই জীবনকথা আমার বর্ণনা ও পত্রগুলিতে পাওয়া যাবে। কামিনীকাঞ্চন বিরাগ সম্বন্ধে যৌবনে সুভাষ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ছিল। কাঞ্চনের ত কথাই নাই—যাকে সোনা দিয়ে ওজন করে লোকে চারবার টাকা দিয়েছে, তার সম্বন্ধে একথা তোলাই ভুল। যে সময়ের কথা বলছি কামিনী সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন ছিল। তার মা তার জন্য খুঁজে খুঁজে কত ভাল

মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, সে রাজি হয় নি। আমার জানাশুনা কয়েকটি মেয়ে তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছিল, একজন আমার কাছে কি করে সুভাষকে পাওয়া যেতে পারে পরামর্শ নিতে এলে বলেছিলাম—বিয়ে আমি দিয়ে দিতে পারি কিন্তু বাসর ঘরে সে আপনাকে বলবে "মা—কেন এমন কাজ করলেন ?"

বিলাত থাকতে কেম্বি্রজের এক পল্লীগ্রামে সে বেড়াতে যায়। রাতে শুতে যাওয়ার সময় ও-দেশের প্রথা অনুসারে বাড়ীর একটী যুবতী মেয়ে সুভাষকে চুম্বন করে। তার জন্য সারারাত সে ঘুমোতে পারে নি। ঢাকা থেকে লাহোর বোম্বাই পর্য্যন্ত কত মেয়ে তাকে চেয়েছে—কিন্তু পায়নি। অষ্ট্রীয়ায় স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিয়ে নাকি এরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সুভাষের sense of humour নাকি ছিল না। আমাকে লিখিত পত্রগুলির মধ্যে কিন্তু মাঝে মাঝে এর আভাস আছে। শ্রীকিরণ শঙ্কর রায় বলতেন, সুভাষকে ঠাট্টা করলে, তিন দিন পরে এসে সে বলতো—একটা হাসির কথা বলেছেন বটে, ব'লে নিজে প্রাণ খুলে হাসতো। কিরণ বাবু One, Two, Three, ব'লে আমাদের সকলকে সে হাসিতে সমভাবে যোগ দেওয়ার জন্যে আদেশ দিতেন!

ক্লাসে ছাত্র না থাকলেও সুভাষ একলা চেয়ারে বসে থাকতো, জিজ্ঞাসা করলে বলতো—কর্ত্তব্য তো করতে হবে। একদিন গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনের নীচের তলায় "সুভাষ কোথায়" জিজ্ঞাসা করাতে কিরণবাবু উত্তর দিয়েছিলেন—সে উপরে বেঞ্চি পড়াচ্ছে!

এমন একটী অ-রসিক দিয়ে আমাকে বহুদিন চলতে হয়েছিল। কোনও দিন সুভাষ যদি ফিরে আসে, আমার এই কার্য্য দেখে কি শাস্তি দেবে জানি না। সে জন্য অতি সাবধানে লিখলাম। রুসোর আত্মজীবনীতে যেমন সব অদ্ভুত কথা আছে, সে রকম কিছু অবতারণা করিনি,

পরে হয়ত কাণমলা খেতে হবে। Truth is stranger than fiction এই কথা মনে রেখেই যৎকিঞ্চিৎ লিখেছি। পাঠকগণের তাতে মনোরঞ্জন হ'লে শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। ক্রমওয়েলের কথায় বলি :—
Paint me as I am, if you leave out the scars and wrinkles I'll not pay you a single farthing.

এই পুস্তকের কয়েকটি অংশ মাসিক বসুমতী, বঙ্গশ্রী, বাতায়ন প্রভৃতি কাগজে বেরিয়েছিল। দেশপ্রাণ শাসমলের ব্লকের জন্য শ্রীবিমল শাসমল, শ্রীবেণীমাধব দাসের ব্লকের জন্য ডাঃ বিমলচন্দ্র দাস ও সুভাষ-চন্দ্রের ব্লকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার শ্রীঅনিলচন্দ্র চৌধুরীর নিকট আমি ঋণী। আমাদের সন্ন্যাসীজীবনের একখানি ছবি যা বহুদিন ধ'রে আমার কাছে রেখেছিলাম, সে-খানিও দিলাম। সুভাষের স্ব-লিখিত পত্রগুলি ব্লক ক'রে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্য দিতে পারলাম না। দুঃখের বিষয় এতদিনের পুরাতন এই পত্রগুলি ক্রমশঃ নষ্ট হতে বসেছে। এই পত্রগুলিই তার কথা তারই মুখে বর্ণনা করেছে। এগুলির ফটোগ্রাফ নিয়ে রাখার বন্দোবস্ত যদি তার অনুরাগী কোনও ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করেন, তাহ'লে ভাল হয়।

দোল পূর্ণিমা
১৭ই মার্চ, ১৯৪৬
৭বি বালিগঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা ১৯

ইতি—
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

"আমি রাত্রি তুমি ফুল।
যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু
আঁধার আকাশ জুড়ি,
সমস্ত নক্ষত্র লয়ে
তোমারে লুকায়ে বুকে
যখন ফুটিলে তুমি
সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ;
ফুরাল আমার কাল
আলোকে ভাঙিয়া গেল
রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি
গুন্ গুন্ মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে
বিস্ময় ব্যাকুল স্বর
গাহে পাখী বহে বায়ু,
প্রমোদ হিল্লোল ধারা
নবস্ফুট জীবনেরে
করিতেছে দিশেহারা।
এত আলো এত সুখ
এত গান এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে ;
আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি
সযতন নীরবতা
শুধু চেয়ে থাকা আঁখি
শুধু মনে মনে কথা।"

প্রথম দেখা

তার মথুরার লীলার কথা সকলেই জেনেছেন—কিন্তু সে যখন বৃন্দাবনে রাখাল বালকদের সঙ্গে গোঠে মাঠে খেলা করত, সে দিনগুলির কাহিনী অনেকেই শোনেন নি। সেই লীলার প্রথম ও প্রধান সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সুখস্মৃতি আমি যক্ষের মত এতদিন বক্ষে লুকিয়ে ধরে রেখেছি। আজ হয় তো সময় এসেছে দেশবাসীর সামনে সেগুলিকে নিবেদন করার।

শারদীয়া সপ্তমীর সুপ্রভাত। ইংরেজী ১৯১২ সালের একটি সকালে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি অলসভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কটক সহরের উড়িয়া বাজার পল্লীতে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি মশায়ের বৈঠকখানায় বসে আছি। এনন সময় একটি গৌরবর্ণ কৃশাকৃতি তরুণ কিশোর এসে তার ছোট্ট করদুটি জোড় করে আমায় নমস্কার করল। আমি অবাক হয়ে তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রভাতের শিশিরস্নাত কুসুমের মত তার পবিত্র মুখখানি, চোখে সোনার

ফ্রেম-দেওয়া চশমা, গায়ে ফিকে নীল রঙের বরফি-কাটা ছিটের লম্বা কোট, তার উপর একখানি পাট করা সাদা চাদর, পরণে ধুতি এবং পায়ে কালো রঙের ফিতে-আঁটা সু। এই মূর্ত্তি দেখে আমি মনে করলাম যে-মানুষ আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—এই সে। ভাবের আবেগে আমি তাকে প্রতি-নমস্কারটি পর্য্যন্ত করিনি—কিন্তু মুহূর্ত্তের অবসরে তার পায়ে আমার জীবন নিবেদন করে দিয়ে মনে মনে অনুভব করলাম, এই সেই বালকবেশী মহাপুরুষ যে একদিন নিজের চরিত্র মহিমায় ও কর্ম্মগৌরবে ভারতের মুক্তি আনবে।

অনেকক্ষণ পরে সুভাষ বললো, "মাষ্টার মশায় লিখেছেন—তুমি আমাদের বাড়ীতে উঠবে, তা ওঠ নি কেন?"

আমি বললাম—"ভাই, তোমরা এত বড়লোক যে আমার মত গরীবের সেখানে উঠতে ভয় করে।"

তার চোখ ভিজে উঠলো—"বড়লোকের ঘরে জন্মেছি ব'লে তুমি আমায় খোঁটা দিলে, আমার কি অপরাধ বলতো ভাই?"

তারপরে দুজনে বসলাম কথা কইতে। সে কথা বহুদিন বহুমাস বহু বৎসরেও শেষ হয় নি।

এই কিশোরটি সুভাষচন্দ্র, আর এই মাষ্টার মশায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, পরবর্ত্তীকালে যিনি শ্রীমতী বীণাদাসের পিতারূপে লোকসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বেণীবাবু কটকের র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুলের হেড

মাষ্টার ছিলেন। সুভাষ কটক ইউরোপীয়ান স্কুল থেকে র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হয়। ঐই স্কুলে সে বেণীবাবুর কাছে দুই বৎসর পড়ে। বেণীবাবু সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না—তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শ ও দেশ-হিতৈষণা তিনি ছাত্রগণের মধ্যে প্রাণ দিয়ে ঢেলে দিতেন। সুভাষ এক নিমেষেই তাঁর প্রিয়তম ছাত্র হতে পেরেছিল। বেণীবাবু যখন কটক থেকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে হেড্-মাষ্টার হয়ে বদ্‌লি হন—তখন সুভাষ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কতক্ষণ না কেঁদেছিল।

আমার বয়েস তখন বছর পনেরো। সুভাষেরও তাই। কৃষ্ণনগরে এসে বেণীবাবুর স্নেহদৃষ্টি আমার উপর পড়লো। আমার শরীর ভাল না থাকায় তিনি পুরীতে চেঞ্জে যাওয়ার জন্যে আমার হাতে সুভাষকে একখানা পত্র দিয়ে কটকে পাঠালেন। আমার সম্বন্ধে পত্রখানিতে লেখা ছিল—A minute's talk wil reveal to you his character. পুরীতে সমুদ্রের ধারে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে তিনি সুভাষকে অনুরোধ করেছিলেন্।

কিন্তু এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ মেলামেশা। এবং সেই মেলামেশার মধ্য দিয়ে একটি যুগ্ম জীবন ধারার সৃষ্টি।

মাষ্টার মহাশয় আশা করতেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সুভাষ ও আমার মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করবে। সুভাষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং ৭০০র

একজন সরকার প্রথম স্থান পায়
৬১৬ কিন্তু সে আমি নই, আমাদের বন্ধু শ্রীপ্রমথ নাথ সরকার; যিনি পরে সিটি কলেজ ও পোষ্ট্ গ্রাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

সুভাষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ক্লাসের পড়াশুনা থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল। নুতন জীবনের আস্বাদে ও কল্পনার রঙীন নেশায় আমি একেবারে মশগুল হয়ে পড়েছিলাম।

প্রথম যেদিন সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—সে-ও দৈনন্দিন জীবনের আচরিত পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কখনও যে সকালে বাড়ীর বার হয় না, সে দুপুর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কথায় বিভোর হয়ে থাকলো। স্নেহময়ী মা তার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন স্মরণ হওয়ায় সে দুপুরে বাড়ী ফিরে খাওয়া শেষ করেই আমার কাছে এল।

"জল্পতোঃ অক্রমেণ" গল্প করতে করতে অধিক রাত্র হয়ে গেল—আমরা হাঁটতে হাঁটতে জোৎস্না প্লাবিত কাটজুড়ি নদীর বাঁধের উপর বেড়াচ্ছিলাম। চারদিন কটকে থেকে ৺বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সুভাষের নিকট বিদায় নিয়ে পুরী গেলাম।

সুভাষের ডাক নাম ছিল 'সুবি।' সুভাষের মা অতি পুণ্যশীলা রমণী ছিলেন। আটটি পুত্রের ও ছয়টি কন্যার তিনি জননী ছিলেন। সুভাষের বাবা রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু শৈশবে অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।

উড়িষ্যার বাঙালীদের তিনি নেতৃস্থ.

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও মিউনিসিপ্যালিটির (রূপে তিনি সহরের সকল সাধারণ কাজে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর আদিবাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। কলিকাতায় পরে তিনি বাড়ী করেছিলেন। এই পুত্রগণের সকলেই পরবর্ত্তী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করেছেন। বড় সতীশচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, দক্ষিণ কলিকাতা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেস মনোনীত সদস্য ছিলেন। মেজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি ওকালতি পাশ করে কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস্ করতে আসেন। পরে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ করে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রধান সহকারী রূপে কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হ'য়ে এবং "ফরোয়ার্ড" পত্রিকার ভার নিয়ে প্রথম রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সহধর্ম্মিণীই সুভাষের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। সুভাষের সেজদা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসু উড়িষ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ওই পদ ত্যাগ করেছিলেন, পরে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনালের অন্যতম এসেসররূপে নিযুক্ত হন। ন'দা সুধীর চন্দ্র টাটা কোম্পানীর কয়লার খনিতে একজন বড় অফিসার। ফুলদা সুনীলচন্দ্র বড় হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার। সুভাষ

পিতা মাতার ষষ্ঠ সন্তান। ছোট ভাই শৈলেশচন্দ্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। আর একটি ভাই সন্তোষচন্দ্র ১৯ বৎসর বয়সেই মারা যান।

সুভাষদের বাড়ীতে সাহেবী চাল চলনের প্রাদুর্ভাব খুবই ছিল। ধর্মপ্রাণা মাতা এজন্য একটু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। আটটি ছেলের মধ্যে সুভাষই তাঁর প্রিয়তম ছিল। সুভাষের ধর্মপ্রাণতা সে মায়ের নিকট থেকেই পেয়েছিল। মায়ের কাছে রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করতে তার বড় ভাল লাগতো।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের সংকল্প

কটকে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুভাষ স্থির করলো ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করে দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। এই সঙ্কল্প গ্রহণের মূলে একটু ইতিহাস আছে।

ইংরেজী ১৯১১ সালে আমি স্বাস্থ্যলাভের জন্য পূজার ছুটিতে অক্টোবর মাসে দেওঘরে বেড়াতে যাই। দেওঘর হাইস্কুলের বোর্ডিং তখন পূজাবকাশে খালি ছিল। সেখানে উঠি। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও যুগলকিশোর আঢ্য নামে মেডিকেল কলেজের দুইজন ছাত্র তখন ওখানে ছিলেন। এই সুরেশচন্দ্রই পরবর্ত্তী জীবনে আই. এম. এস.

হয়েছিলেন, কুমিল্লা অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের শ্রমিক প্রতিনিধি, শ্রম মন্ত্রী, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি ও পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সুরেশচন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয়েছিল। তখন তিনি মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তেন—যুগলকিশোর পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তখনকার দিনে যুগল কিশোরের মত মেধাবী ছাত্র মেডিকেল কলেজে আর কেহ ছিলেন না; তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হতেন এবং অনেক গোল্ড মেডাল পেয়েছিলেন ও মাসিক ৮৫৲ বৃত্তিলাভ করেছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের সংকল্প ছিল আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। যুগলকিশোর ছিলেন এই সংকল্পের সহায়ক। দেশের যুবকদের নিয়ে একটা দল বেঁধে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। এই উদ্দেশ্যে আমিই তাঁর প্রথম শিষ্য হই এবং তাঁর প্রেরণায় নিরামিষ আহার ত্যাগ করে একেবারে মুর্গীর ডিম খেতে আরম্ভ করি!

কলিকাতা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে ৫৩ নং বাড়ীতে আমাদের প্রথম আড্ডা বসে। সেখানে সুরেশদা ও যুগলদা ছাড়াও শ্রীযুত আশুতোষ দাস নামে মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন। আশুদা পরবর্ত্তী জীবনে ডাক্তারি পাশ

করে গ্রামে চিকিৎসা করতেন। এক সময়ে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে কমিশন নিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে এ'সে কিছুদিন পরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে ৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা মেডিকেল মেসে পরে সুরেশদারা আসেন। কটক থেকে ফিরে এসে সুভাষের সমস্ত কথা সুরেশদাকে বলি। সুভাষের সঙ্গে সুরেশদার চিঠিপত্র চলতে থাকে। আমিই সুভাষকে দলে ভিড়াই।

আমি কটক থেকে চলে আসার পর সুভাষ বাংলাভাষায় প্রথম আমায় চিঠি লেখে। সে চিঠি যেন ইংরেজীর অনুবাদ। একটি লাইন মনে আছে "মাষ্টার মশায়কে বলিও আমায় চিঠি লিখিতে"। দুঃখের বিষয় চিঠিখানি আমার কাছে নাই।

১৯১৩ সালের ১লা মার্চ আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়। পূর্ব্ব বৎসরের পূজার ছুটি থেকে পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমরা নূতন জীবনের আলোড়নে পড়াশুনায় তেমন মন দিতে পারি নি। ব্রহ্মচর্য্য পালন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, রোগী এবং দুঃস্থের সেবা ইত্যাদিতেই কটকে সুভাষের ও কৃষ্ণনগরে আমার সময় কাটতে লাগলো।

লোক সেবা

কটকে ছেলেদের একটি মেস ছিল। সেই দলের সর্দা্র ছিলেন শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেঁপো রুগী, কি জনসেবায় নিবেদিত প্রাণ। সুভাষ গিরীশদার সাহচর্যে রুগী এবং আর্ত্তগণের সেবায় নিযুক্ত হ'ল। এই রোগীদে মধ্যে একজন বসন্তে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন। সুভাষের বাবা আতঙ্কিত হলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানরূপে এই রোগ যাতে বিস্তৃত না হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তিগণের যথোচিত শুশ্রূষা হয়, তিনি তার ব্যবস্থা অবিলম্বে করলেন কিন্তু সুভাষকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

ভ্রমণ

পরীক্ষার পর সুভাষ কৃষ্ণনগরে আমার কাছে এসে কিছুদিন থাকবে, কটক থেকেই স্থির করে এসেছিলাম। ১৯১৩ সালের মে মাসে সুভাষ কৃষ্ণনগরে এল। আমাদের

বাড়ীতে উঠল। সুরেশদা ঠিক করেছিলেন, সদলবলে কৃষ্ণনগরে এসে পলাশী মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখতে যাবেন। কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেণে আমরা পলাশী গেলাম। ষ্টেশন থেকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র মাইল তিনেক হবে। পলাশীর সে আম্রকানন আর নাই। দর্শকদের জন্য একটি ডাক বাংলা ও যুদ্ধের বিজয় স্মৃতিস্তম্ভ মাঠের মাঝখানে লর্ড কার্জনের আদেশে তৈরি হ'য়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে করতে আমি কবি নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করেছিলাম মনে আছে। সেনাপতি মোহনলালের মুখে যে শেষ কথাগুলি কবি শুনিয়েছেন, তার আবৃত্তি শুনে সুভাষচন্দ্র চোখের জল ফেলেছিল।

পলাশীর স্মৃতিস্তম্ভের মার্বেল ফলকের গায়ে সুরেশদা খড়িমাটি দিয়ে লিখে দিলেন—"Monument of glaring Treachery !" চৌকিদার এসে ধমক দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা সযত্নে মুছে দিল।

পলাশী দেখে আমরা চললাম মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে। বহরমপুরে গিয়ে উঠলাম আমার সম্পর্কীয় এক মামার বাড়ীতে। শ্রীযুত অমূল্য উকিল, অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত, যুগলদা প্রভৃতি আমরা ছয় জন ছিলাম। মামীমা অতি আদর করে আমাদের খাওয়ালেন। বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ মাইল ছয়েক হবে। আমরা হেঁটে যাত্রা সুরু করলাম। সঙ্গে ছিল নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"। মধ্যে মধ্যে পড়া হতে লাগলো।

মুর্শিদাবাদ সহরে গিয়ে আমরা উঠলাম ডাঃ দবিরুদ্দিন আমেদের বাসায়। সুরেশদা ও যুগলদার এঁর সঙ্গে মেডিকেল কলেজ থেকেই পূর্ব্ব হতে আলাপ ছিল। অসময়ে উপস্থিত হই—তখন গৃহস্থের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। তবুও ডাঃ আমেদ ছাড়লেন না—আলুভাতে ভাত ঘি দিয়ে খাওয়া হ'ল। এই ডাঃ আমেদই পরবর্তীকালে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যে নবাবের প্রাসাদ, মোতিঝিল, হাজার দুয়ারি, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কবর, প্রভৃতি দেখার সুবিধা হ'ল। বড়নগরে রাণী ভবাণীর মন্দির পর্য্যন্ত দেখে আমরা ফিরলাম। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস—রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটতে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মিষ্টি আম খেতে খেতে গিয়েছিলাম।

খোশবাগে সিরাজ উদ্দৌলার কবরের অনাড়ম্বর সজ্জা দেখে আমাদের প্রাণ খুবই ব্যথিত হয়েছিল। সন্ধ্যায় একটি মাত্র রেড়ির তেলের প্রদীপ দেওয়া হ'ত।

এই ভ্রমণ কাহিনী লিখতে গিয়ে আজ একটি ব্যথাময় স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমরা হেঁটে চলেছি—মাঠের দু'ধারে অড়রের ক্ষেত। সুভাষের জীবনে পল্লীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। অত বড় সবুজ ক্ষেত দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—এটা কিসের বন? আমি উত্তর করলাম—অশ্বত্থ গাছের বন! খানিক দূর এগিয়ে আর একটী অড়র ক্ষেত দেখে সুভাষ বললো, কত বড় আর একটী অশ্বত্থ বন, দেখ। সঙ্গীরা সকলে হেসে উঠলেন।

সুভাষ হাসির কারণ বুঝতে না পেরে ছলছল চোখে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—ওরা হাঁসলো কেন? আমি বললাম—ওগুলো অশথ গাছ নয়, অড়র গাছ। সুভাষ আমায় সুধালো—তুমি আমায় এমন অপ্রস্তুত করলে কেন? বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে ধারা ব'য়ে জল পড়তে লাগলো। এই নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যথা আজও যেন আমার বুকে কাঁটা হ'য়ে আছে। সেই থেকে আর কোনও দিন আমি তার সঙ্গে পরিহাস করিনি।

সুভাষ সব সময়ে ঠাট্টা বুঝতো না। তার সরল কোমল প্রাণে এই আঘাত দেওয়ার কথা আমি ভুলতে পারিনি। সুভাষ কথা কইতো কম—তার মনটা যে কত নরম ছিল, তার পরিচয় আমি কতই না পেয়েছি এবং তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমি ভবিষ্যতে অত্যন্ত সাবধান ছিলাম। (ছেলেবেলায় ক্ষিধে পেলে সে মুখ ফুটে কখনো বলতো না—হাতের বুড়ো আঙুলটি মুখে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুষতে থাকতো। তার এক বুড়ী ঝি ছিল, সে বুঝতে পেরে তখনি দুধ খাবার এনে খাওয়াতো।)

মুর্শিদাবাদ থেকে আমরা একখানি নৌকো ভাড়া করে ফিরলাম বহরমপুরে। বর্ষার গঙ্গা—জ্যোৎস্না রাত, দাঁড়িরা তালে তালে দাঁড়ের শব্দ ও তার প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। আমরা নৌকোর ছাদে ব'সে। সুভাষকে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে বললাম একখানি গান করতে, সে আমার কথায় রাজি হ'লো—গাইলো,

"দূরে হের চন্দ্র কিরণে উদ্‌ভাসিত গঙ্গা
ধায় মত্ত হরষে, সাগর পদ পদ পরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময়ী বরষা
শ্যামধরণী সরসা—"

নবদ্বীপ ভ্রমণ

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে যাওয়ার আগে সুরেশদা, যুগলদা, গুরুদাসদা, সুভাষ ও আমি নবদ্বীপ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে যুগলদাদের এক ঠাকুর বাড়ীতে উঠলাম। নাদুস নুদুস বাবাজী মশায়ের তিনটি সেবাদাসী ছিল। খাওয়ার সময় তরুণী সেবাদাসীটি আসায় সুরেশদা জ্ব'লে উঠলেন এবং বললেন—ধর্মের নামে বাড়ীঘর ছেড়ে এখানে এসে বুঝি বেশ্যাগিরি করা হচ্ছে! বাবাজী কাছেই ছিলেন, চ'টে আগুণ হলেন। ফলে আহার শেষেই সেখান হতে বিদায় নিতে হ'লো।

সন্ধ্যার পর নৌকায় কৃষ্ণনগর ফিরবার পথে উজান স্রোতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মাঝিটি আনাড়ি হওয়ায় সুরেশদা হাল ধরলেন, আর যুগলদা, সুভাষ ও আমি গুণ টানতে লাগলাম। আগের অভ্যাস থাকায় সুরেশদার হাল ধরতে কোনও কষ্ট হয় নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কষ্ট

হয়েছিল সুভাষের। 'বড়লোকের ছেলে, সোনার চাঁদের মত চেহারা, ছোটকাল অবধি আদর অহ্লাদের মধ্যে লালিত পালিত, দুঃখের আঁচড় গায়ে লাগে নাই যে কখনো।' সুভাষকে নিবৃত্ত হ'তে বললেও সে কথা শোনে নি।

কলেজে শিক্ষা

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর সময়টা নষ্ট না ক'রে কৃষ্ণনগর শ্রমজীবি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হ'য়েছিলাম। কলিকাতা থেকে শ্রীযুত শৈলেন ঘোষ এসে এই কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। ইনিই পরে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং বহুবৎসর পরে ফিরে এসে কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

আমাদের নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে সুভাষ মধ্যে মধ্যে এসে যোগ দিত। জুলাই মাসে কলেজ খুললে সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। ম্যাট্রিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পেলেও, কটকে না পড়ার জন্যে সে ঐ বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পেল। লজিক, সংস্কৃত ও অঙ্ক তার optional subject ছিল। আমিও

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম—কিন্তু দলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরে কাজ করার জন্য আমাকে কৃষ্ণনগর কলেজেই ভর্ত্তি হ'তে হ'ল। নীলমণি সেনগুপ্ত বলে কটক প্রবাসী একজন সমপাঠীকে সুভাষচন্দ্র কৃষ্ণনগরে পাঠালো। নীলমণি টিউসন্ করতো এবং সুভাষচন্দ্র নিজের স্কলারসিপের টাকা থেকে তাকে সাহায্য করতো। নীলমণি পরে বি, এস, সি পাশ করে দৌলতপুর কলেজে ডিমন্সট্রেটর হয়। অরবিন্দ মুখার্জ্জি নামে আর একজন সহপাঠী আমাদের দলে এই সময় কৃষ্ণনগরে যোগ দেয়। দেশবন্ধুর "বাংলার কথা"র প্রিন্টার ও পাবলিসাররূপে ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন শাসমল ও আমার সঙ্গে ছিল। অরবিন্দ এখন বিহারে বেতিয়ার একটি ইস্কুলে মাস্টারি করছে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সে সময় কৃষ্ণনগর সি, এম, এস্ ইস্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। বিজয় আমাদের সংস্পর্শে আসেন।

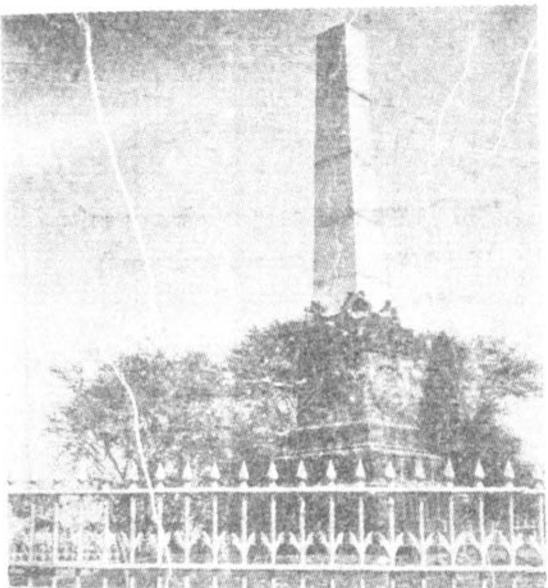
কৃষ্ণনগরে আমরা শুষ্ক অঞ্জনা নদীর ধারে রোজ বিকেলে সমবেত হ'তাম। ধর্ম্মচর্চা, রাজনীতি আলোচনা হ'ত। কলকাতা থেকে এসে সুরেশচন্দ্র, সুভাষ প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত ও হেমচন্দ্র সরকার আমাদের কাজে সহায়তা করতেন। পরে যুগলদাকে যখন বিলাত পাঠান হয়, তখন এঁরা দুজনেই অর্থ সাহায্য করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়ে সুভাষচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে

"শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি হ'লেন আমাদের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস।...তখন আমার বয়স বারোর কিছু বেশী হবে।" (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী "ভারত পথিক" হইতে)



শ্রীবেণীমাধব দাস



জাতির কলঙ্ক—পলাশীবিজয় স্তম্ভ

"পলাশীর ঘৃণ্য পাপে মহাপঙ্কে পতিত যে জাতি,
অস্ত্রহারা অসহায়, অপমান নিত্য যার সাথী
ভীরু কাপুরুষ হীন অপবাদে কলঙ্কিত যারা
দাসত্বের গুরুচাপে দিনে দিনে যারা শক্তিহারা,
তাহাদের মাঝে তুমি এসেছিলে যে এক বিস্ময়,
হে আদি সমরগুরু কীর্ত্তি তব ভুলিবার নয়।
চেয়েছিলে বাহুবলে মাতৃভূমি করিতে উদ্ধার,
বিপ্লবের জয়ধ্বনি বজ্রকণ্ঠে করেছো প্রচার।

—নরেন দেব

অধ্যাপকগণের বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়েছিল এবং কলেজের ম্যাগাজিন, ডিবেটিং ক্লাব এবং poor fund প্রভৃতি সংগঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকগণের মধ্যমণি ছিলেন এবং ছাত্রেরা তাঁহাদের দ্বারা ঐ কলেজে আকৃষ্ট হইত। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের হাওয়া বদলে গেল। অধিকাংশ ছেলেই বড় ঘরের। সুভাষচন্দ্রের সাধাসিধা পোষাক, আদর্শ জীবন, পরোপকারবৃত্তি ছাত্রগণের মনোহরণ করেছিল। ৩৮/২ নং এলগিন রোডের বাড়ী থেকে ট্রামলাইন ৫।৬ মিনিটের পথ। কলেজ যাওয়ার জন্যে পকেটে যে ট্রামভাড়া নিয়ে সুভাষ বেরুতো, তা ঐ রাস্তাটুকুর ভেতর অনেক সময় ভিখারীদের দিতেই ফুরিয়ে যেতো। হেঁটেই সুভাষকে কোনও কোনও দিন ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতে হ'ত। সে প্রায়ই সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে বই পড়তে পড়তে যেত। যে দিন হেঁটে যেতো সেদিন ক্লাসে লেট্ হ'ত। কিন্তু সহৃদয় অধ্যাপকরা সেজন্য তাকে কিছু বলতেন না এবং present মার্ক করে রাখতেন। কেবল একদিন প্রোফেসার ষ্টার্লিং present করতে চাননি। সুভাষ ক্লাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় ষ্টার্লিং বললেন, "আমার বিনানুমতিতে যেতে পাবে না।" সুভাষ তখন অনুমতি নিয়ে ক্লাসের বাইরে চলে গেল।

রাজনীতি চর্চার সূত্রপাত

কলেজের ছুটির পর সুভাষ ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অথবা আমার কাছে অনেক সময় কৃষ্ণনগরে চলে আসতো। আবার পরদিন সকালে ওখান থেকে কলেজে আসতো। ৩নং মির্জ্জাপুরের দল তখন বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। কটক কেন্দ্র থেকে গিরিশ ব্যানার্জি, নৃপেন বসু, বিধু রায়, অন্নদা চৌধুরী, শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে আসতেন। ঢাকা কেন্দ্র থেকে শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষ যোগ দিয়েছিলেন। আর কলকাতা কেন্দ্র থেকে শ্রীযুত সুবোধ মিত্র, ভূপেশ দাশগুপ্ত, হেমেন ঘোষ, দেবেন বাঁড়ুয্যে, প্রমথ সরকার, ধীরেশ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি ছিলেন। কৃষ্ণনগর থেকে আমি, হেমেন্দ্র সেন প্রভৃতি আসতাম। শ্রীযুত জীবনরতন ধরও ৩নং মির্জ্জাপুরে থেকে মেডিকেল কলেজে পড়তেন। তাঁর ভ্রাতা নীলরতন ধর ১১০নং কলেজ ষ্ট্রীটের একটা মেসে থাকতেন। সেখানে শ্রীযুত মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি প্রভৃতি ডাঃ পি সি রায়ের মেধাবী ছাত্রগণ থাকতেন। এঁদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করতাম। এই

মেসে বিপ্লবী নেতা যতীন মুখুয্যে মাঝে মাঝে আসতেন—তাঁর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছিল। এছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু-হোষ্টেলেও আমাদের কয়েকজন থাকতেন। সেখানে বহু ছাত্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। শ্রীযুত জ্যোতির্ময় ঘোষ, যোগেন সাহা, শৈলেন ঘোষ, নলিনাক্ষ্য সান্যাল, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এঁদের অন্যতম।

এই সময়টা স্বদেশী ডাকাতির যুগ। হিন্দু হোষ্টেলে ৫নং ওয়ার্ডে ছোট ছোট কুটুরি ছিল—এখানে রিভলবার প্র্যাকটিস্ চলতো। একদিন সুভাষ ও আমি ওখানে থাকতে থাকতে পুলিশ সার্চ হ'য়ে গেল। ফাঁড়া ভালয় ভালয় কেটে গেল।

আমরা মাঝে মাঝে বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে যেতাম। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা রাজনীতির প্রশ্রয় দিতেন না। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে সুভাষ গিয়ে বসতো। একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে সে ডুবে গিয়েছিল—প্রফুল্ল দা তাকে উদ্ধার করেন। সুভাষ সাঁতার জানতো না। কৃষ্ণনগরে গিয়ে জলাঙ্গী নদীতে নাইতে নাইতে আমার কাছে একটু একটু সাঁতার দেওয়া শিখেছিল।

কৃষ্ণনগর থেকে একদিন সুভাষ, অরবিন্দ, ধীরেন মণ্ডল ও আমি চললাম বাগাঁচড়া গ্রামে। আমাদের সঙ্গে এক-জন মুসলমান সহপাঠী ছিল। তার নাম দেওয়া হ'ল 'বঙ্কিম'। শান্তিপুরের নিকট বাগাঁচড়া আমার পৈতৃক বাস-

স্থান। এই গ্রামে আলিপুর বোমার মামলার আসামী নিরাপদ রায় ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ ও তাঁর ভাই স্বামী বাসুদেবানন্দ জন্মেছিলেন। নিরাপদ দা দশ বছর দ্বীপান্তর বাস ক'রে তখন গ্রামে ফিরে এসে তাঁত নিয়ে বসেছেন। গৌরবর্ণ রং, ছোট্টখাটো মানুষটি, পরে গেরুয়া ছোপান ধুতি, গলায় সাদা ধবধবে পৈতাগাছি, মুখে হাসি লেগেই আছে, এই সাধকের সামনে গিয়ে আমরা প্রণাম করলাম। সুভাষের পরিচয় পেয়ে নিরাপদদা খুব খুসী হ'লেন এবং প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন, যাতে আমরা বড় হ'য়ে দেশের কাজ করি এবং গ্রামকে না ভুলি। কিছুদিন পরে নিরাপদদা নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। এই নীরব সাধকের আশীর্ব্বাদ ও কথাগুলি চির-দিনের জন্য আমাদের মনে ছাপ দিয়ে যায়।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমাদের দলবল নবদ্বীপ যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে এসে অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে উঠলেন। সুভাষও এই দলে ছিল। ঘটনাচক্রে নবদ্বীপ যাওয়া হ'ল না—সকলে মিলে হেমবাবুর বাসার সামনে নদীর ধারে কীর্ত্তন করে সারারাত কাটানো গেল।

প্রথম সন্ন্যাস

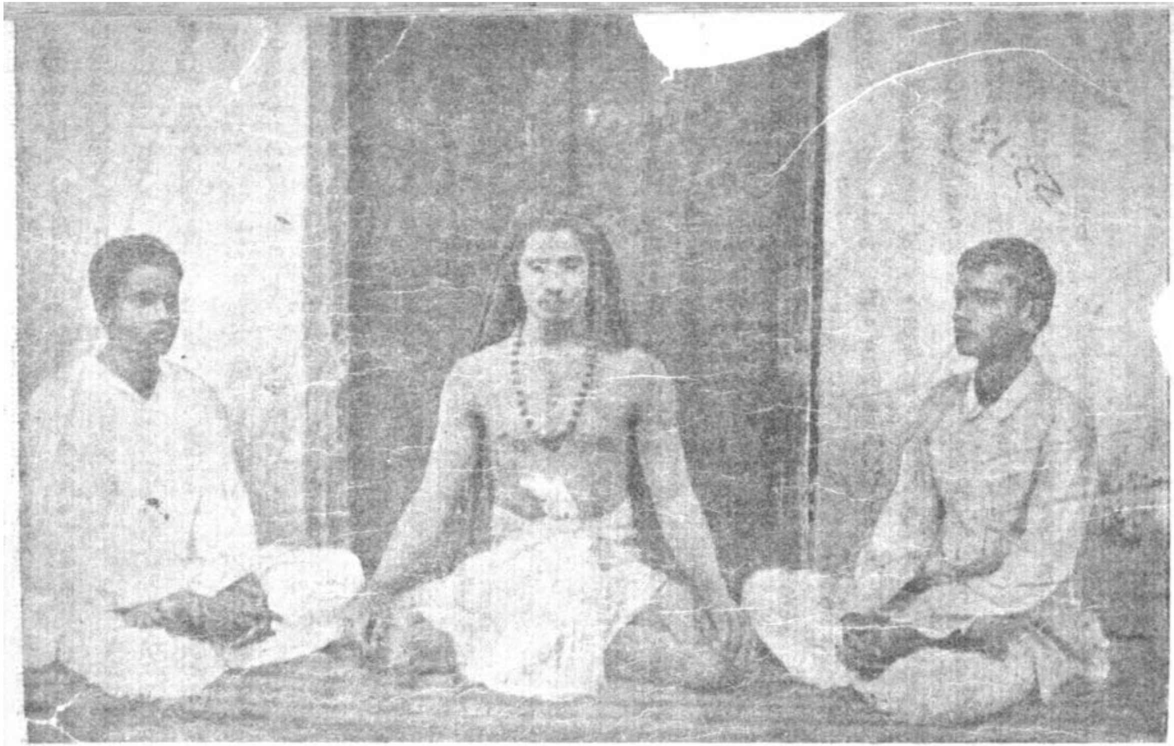
পরবর্ত্তী বড়দিনের ছুটিতে (১৯১৩) সন্ন্যাসী জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের গঙ্গার ধারে ৺ভরত পোদ্দারের একটি খালি বাড়ীতে দলের অনেকে এলেন, এর মধ্যে সুভাষও ছিল। সুরেশদা তাঁর "জীবন প্রবাহ" নামক আত্মচরিতে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"সকলের কাপড়ে গেরুয়া রং দেওয়া হইলো—আমারও। আঠারো উনিশ জন যাইবে ঠিক হইল। রওনা হওয়ার আগের দিন নবীন মুখুয্যের কঠিন অসুখের সংবাদ পাওয়ায় আমার আর যাওয়া হইলো না। যারা গেল তাদের সকলের নাম মনে নাই। এ-ক-জন গিয়েছিল বলিয়া মনে পড়ে (১) গুরুদাস (২) যুগল (৩) প্রফুল্ল (৪) যোগেন সাহা (৫) বিধু রায় (৬) শশাঙ্ক মুখার্জ্জি (৭) প্রমথ সরকার (৮) সুভাষ বসু (৯) হেমন্ত সরকার (১০) অরবিন্দ মুখার্জি। এরা শান্তিপুরে সন্ন্যাসী জীবনের সমস্ত রকম কৃচ্ছ্র তাই অভ্যাস করে। শেষরাত্রে উঠিয়া গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ গা ডুবাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়ও। চাঁদপুর হইতে কলি-

কাতা আসিয়া দেখি শান্তিপুরের দল ফিরিয়াছে। দেখিয়া মনে হইলো প্রত্যেকে যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সন্ন্যাসী হওয়ার জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা সকলের চোখে মুখে। সন্ন্যাস সম্বন্ধে নিত্য নূতন উপদেশ দিয়া আমিও তাদের সে আগুণে ইন্ধন যোগাইলাম।”

সুরেশদার ঠিক স্মরণ নেই শান্তিপুরে কে কে গিয়েছিলেন—অন্ততঃ প্রমথ সরকার যান নি—আমার বেশ মনে আছে। তবে তার যাওয়ার কথা হয়েছিল—এ-কথা ঠিক।

এই সন্ন্যাস-জীবনে একটি বড় মজার ঘটনা ঘটেছিল। একদিন দুপুরে সুভাষ রান্না করছিল, আমি গিয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে নাইতে। একদল লোক শ্মশান ঘাটে মড়া নামিয়ে কাঁদছে আর ভগবানকে ডাকছে, “বাবাকে বাঁচিয়ে দাও।” গেরুয়া-পরা কালোবরণ আমাকে হঠাৎ সেখানে দেখতে পেয়ে বললো, “ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, এইবার বাবা বেঁচে উঠবেন।” আমি কত প্রতিবাদ করলাম, কে শোনে ? বলে, “ঠাকুর ছলনা ক’রো না—বাবার প্রাণ ফিরিয়ে দিতেই হবে।” আমি নিরুপায় হয়ে বুদ্ধদেবের সেই কথা বললাম—“যে বাড়ীতে কেউ কখনো মরে নি, এমন বাড়ীর কয়েকটি সরষে নিয়ে এস, বাঁচিয়ে দিচ্ছি।” তারা বুঝলো এটা অসম্ভব।

তারপর গঙ্গায় ডুব দিয়ে ফিরছি, এদিকে আমার দেরী দেখে সুভাষচন্দ্র আমায় খুঁজতে এসেছে। পথের মাঝে একটি বিধবা মেয়ে, সঙ্গে একটি ঘোমটা দেওয়া বউ।



হেমন্তকুমার সরকার ইন্দুদাস বাবাজী (১৯১৩) সুভাষচন্দ্র বসু

"প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি ১৯১২ সালে আমারই বয়সী একটী ছাত্রের (হেমন্তকুমার সরকারের) কাছ থেকে। ছেলেটী কটক ও পুরীতে বেড়াতে এসেছিল। সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে মাত্র মাথা ঘামাতে শুরু করেছি এমনি সময়ে ছেলেটীর আবির্ভাব। আগন্তুক ছেলেটী একদিন সুযোগ বুঝে দেশের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বহু উপদেশ দিল। সব শুনে ত আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম···আমরা সকলেই ছেলেটীর আবির্ভাবকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলেই মনে করলাম।"

কলকাতা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে একটী ছোট সহরে (কৃষ্ণনগরে নদীর ধারে পাঞ্জাব থেকে আগত এক তরুণ সন্ন্যাসী (বাবাজী ইন্দ্রদাস) বাস করতেন। আমার বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে নিয়ে সুযোগ পেলেই আমি তাঁর কাছে যেতাম। সন্ন্যাসীটী কখনও কারুর বাড়ীতে যেতে চাইতেন না। তাঁর আদর্শ ছিল বোধ হয়—

আকাশটা ছাদ, ঘাসের বিছানা শয্যাঃ
ভাগে যা জোটে, তাই দিয়ে রোজ উদরের পরিচর্য্যা।

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম এই তরুণ সন্ন্যাসী কিভাবে পার্থিব ভোগ সুখের ক্ষা ও শীত-গ্রীষ্মানুভূতি সম্পূর্ণ জয় করেছেন। দুপুরবেলা প্রচণ্ড রোদ্দুরের তিনি পঞ্চাগ্নি জ্বালিয়ে তার মাঝখানে বসে ধ্যান করতেন। রাত্রিবেলা কে সময়ে তাঁর গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যেত, কিন্তু তাতে তাঁর নিদ্রার ঘাত হত না। তাঁর নির্ম্মল চরিত্র এবং স্নেহশীলতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি কখনও কারুর কাছে কিছু চাইতেন না, লোকেরা নিজের থেকেই দলে দলে এসে তাঁকে খাদ্যবস্ত্র দিয়ে যেত। ঠিক যতটুকু তাঁর প্রয়োজন তার বেশী তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না। তাঁর দর্শন প্রার্থীর মধ্যে সি, আই, ডির লোকও ছিল—তারা অনুসন্ধান করত সন্ন্যাসী বাস্তবিকই নিরীহ কি না। তিনি যদি আর একটু মননশীল হতেন, তবে সারাজীবনের জন্যই হয়তো আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতাম।" (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী "ভারত পথিক" হইতে)

মাদের দেখে বললেন, "বাবা মায়ের
নে এই বয়সে গেরুয়া পরেছ, যা বাড়ী ফিরে যা।
ওদিকে ঘোমটার ভিতর থেকে টস্ টস্ করে চোখের জ
পড়ছে। আমাদেরও চোখ ভিজে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ী
কথা ভাবতে ভাবতে দুজনে ডেরায় ফিরে এলাম।

কিছুদিন পরে ইন্দ্রদাস বাবাজী নামে উদাসী শিখ সম্প্রদায়ের এক তরুণ সন্ন্যাসী কৃষ্ণনগরে এলেন। ইনি নদীর ধারে ধুনি জ্বেলে বসে থাকতেন। বৃষ্টি এলে মাথায় একটা হাঁড়ি দিয়ে থাকতেন। শীত, বরষা সমানভাবে আকাশতলে বসে কাটাতেন। ইনি হঠযোগী ছিলেন। রাতে ৪টার সময় নাইতে গিয়ে "নেতি ধৌতি" করতেন। মেয়েরা বাবাজীকে ফল মূল দুধ উপহার দিতেন। অনেক ভক্তও জুটেছিল। কেউ কোনও ওষুধ চাইলে ইন্দ্রদাস বাঁশের ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করতেন এবং বলতেন—"ভাগো, হিঁয়াসে, মার ডাণ্ডাসে পিট দেঙ্গা, বাবাজী ডাক্তার হ্যায় ?" এই তরুণ সন্ন্যাসীটির নিকট আমি ও সুভাষ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাদিগকে খুবই ভালবাসতেন। কয়েকমাস পরে বললেন—"তোমাদের উপর আমার এম মায়া বসে গেছে যে সন্ন্যাসীর পক্ষে তা বিপজ্জনক হঠাৎ একদিন বাবাজী উধাও হ'লেন। তারপর প্রয়া কুম্ভমেলা থেকে আমাদের একখানা চিঠি লিখেছি সুভাষের ও আমার প্রয়াগ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু কারণে ঘটে নি। ইন্দ্রদাস ইতিপূর্ব্বে নানকশরণ দাস

পুর নিবা- র একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আল।
য়ে দেন। নানক-ণ বাবাজীর কাছে আমরা মধ্যে মা
তাম। এইসময়ে সুভাষচন্দ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শেও
াসেন।

উত্তর ভারত ভ্রমণ

১২ই মে, মঙ্গলবার, ১৯১৪। এইদিন অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্তের সঙ্গে রওনা হ'লাম উত্তর-পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণে। গুরুর অনুসন্ধান করতে হ'বে—গুরুলাভ হলেই আমি তার রবো, সুভাষ এসে যোগ দেবে। হাওড়া ষ্টেশনে হঠাৎ অরবিন্দ এসে জুটলো। সুভাষ আমাদের গাড়ীতে বসে-ছিল—গাড়ী ছেড়ে দিতেই নেমে পড়লো। হাসতে হাসতে সে আমায় একটি চড় দেখালো। আমিও যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলাম। বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, মন্দার পাহাড়, পাটনা, এলাহা-বাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, দেরাদুন, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান ঘুরে রিদ্বার পৌঁছুলাম। ওখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্থানের একটি শালায় উঠলাম। দিল্লীতে আমার অনুতপ্ত মনোভাবের খণ্ড চিঠির উত্তরে সুভাষের চিঠি পেয়েছিলাম। নীচে র চিঠিখানি উদ্ধৃত করে দিল্যম—

কলিকাতা, শুক্রবার
২২শে মে, ১৯১৪।

"তোমার হৃদয়ের তপ্তশোণিত ঢা[illegible]পত্র এইমাত্র পাইলাম। তুমি এখন কোথায় আছ জান না—তাই এ হেন অবস্থায় তোমাকে দূর দেশে রাখিয়াও আমাকে এখানে অবস্থান করিতে হইতেছে। এতক্ষণে বোধ হয় দিল্লী ছাড়িয়াছ—হরিদ্বারে গেলেও তোমাকে খুঁজে পাবার আশা নাই, কারণ হয়ত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াচ্ছ। যাইব কিনা এ বিষয়ে অনুমতি কালকার পত্রে চাহিয়াছি—যদি সে অনুমতি পাই, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে রওনা হইব। এ পত্র তুমি পাবে কিনা জানি না—তবে যদি পাও, আমার অনুরোধ ও ভিক্ষা, তোমরা যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিও। কোন স্থান দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি আমার এ ভিক্ষা পূরণ করিবে।

"জীবনে আমার নিকট তুই কোন অপরাধ করিস নাই—করিতে পারিসও না। আমার কথায় কি বিশ্বাস করিবে? অপরাধ আমি কত করিয়াছি। তোমার প্রাণে কতবার এত কষ্ট দিয়াছি যে তুমি আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। "ক্ষমা চাহিবার অধিকার নাই" ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বেই চিরকাল ধরে তোমাকে ক্ষমা করে আছি—যদি নিতান্ত ক্ষমা চাও। তুমি চাইতে না পারিলেও আমি করিব—তুমি মুখ তুলিয়া ভালবাসা না চাহিতে পারিলেও, আমি লক্ষাধিক গুণে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু আছে—সবই তোমার "আমার চিরদিবসের" সেই দেবচরণে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিব। তুই না চাহিতে পারিলেও কি আমি দিতে পারি না?

তুমি চাও বলেই তা ভালবাসা দিই—না নিজে হইতে আমি ভালবাসার জন্য for love's sake ভালবাসা দিই তাই তুমি আজ না চাহিলেও না চাহিতে পারিলেও তোমার হৃদয় বুঝিয়া, হৃদয়ের অভাব বুঝিয়া—লক্ষাধিক গুণে দিব। আমি যে চিরকালই তোমার—তুমি যে চিরকালই আমার—এ কথাটি ভুলিস না, তুমি আমার দেবতা, চিরকালের দেবতা, এখনও পর্য্যন্ত হৃদয়ের এই দুঃখ যে আজ পর্য্যন্তও সে দেবতার পূজার উপযুক্ত হইলাম না। জান না তুমি আমার চিরকালের কৃষ্ণ। জগতের লোকেরা তোমাকে যাহাই বলুক—আমার তুমি চিরকালের দেবতা। ভক্তের কাছে সেই প্রেমাবতার কৃষ্ণ। তুমি আজ আমার সেই চিরদিবসের প্রেমাবতার। ন্যায় অন্যায়ে আমার কাজ নাই—পাপ পুণ্য আমি বুঝি না।

"কোথায় হইতে ডেকে এনে কোথায় বসাবি? আমি কি এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার হৃদয় ছাড়িয়াছি যে তুমি পুনরায় ডাকিবে, যদি ছাড়িয়া আসিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে ত ডাকিতে হইত। কিন্তু আমি ত ক্ষণেকের জন্যেও সেই সিংহাসনের লোভ ছাড়িতে পারি নাই—পারিবও না। কেহ যে সেখান হইতে তাড়াইতে পারিবে না—তাড়াইলেও আমি এক inchও নড়িব না, আমি এরূপ অচলভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত। জীবনে জীবনে সেখানে বাস করে আসছি—আজ আমার সে property ছাড়িব কেন?

"হৃদয় সিংহাসনে তাহাকে বসিবার জন্য বলিতে হইবে না, কারণ সে সেখানে চিরকাল ধরে বসে আছে, কখনও

নড়ে নাই, তবে কেন কষ্ট পাচ্ছ? চক্ষু খুলিয়া দেখ সে সেখানেই আছে।

"যথাশীঘ্র পত্রের উত্তর দিও এবং ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিও। না আস ত লিখিও, তোমার সঙ্গে দেখা করিব। তুমি লিখিয়াছ সেই মুহূর্তেই আমি সেই দেবতাকে হত্যা করিয়া হৃদয় হইতে ফেলিয়া দিয়াছি। একি হইতে পারে? তোর কি ফেলিবার শক্তি আছে? আর আমি কি ফেলিলেও সে সিংহাসন ক্ষণেকের জন্য ত্যাগ করিব? কখনই না, আমি যে সেখান থেকে টলিতে পারি না, টলাইলেও টলিব না। তুমি লিখিয়াছ, "তুমি তাহাকে স্মরণ করিবারও যোগ্য নও।" স্মরণ না করিতে পারিলেও সে যে চিরকালই তোমার। সে কথা ভুলিস না। তোকে ছেড়ে কি থাকতে পারি? তবে কেন বৃথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ? * * * এক গতি—"তোমারই পতাকা করিয়া লক্ষ্য আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া।" এ পথ পরিষ্কার। অনন্যোপায় হইলে এই পন্থা অনুসরণ করিব। সংসারকে ত পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছি, এখন সেই একের দিকে- - -

"আর আমার দেবতা যদি বাস্তবিক কিছু অন্যায় করিয়া থাকে, তবে তার ফলটুকু আমার। লোকে যজ্ঞ করে, কাজ করে, ভাল মন্দ সমস্ত ফলটুকু দেবতার। তুমি আমাকে হৃদয় দেবতা করিয়াছ চিরকাল ধরে- তোমার ভাল ফলটুকু আমার—সে যে অতি প্রিয় বস্তু কারণ সে যে তোমার।

তুমি অমৃত ভিন্ন কিছুই আমাকে দিতে পার না—যে আকারে যে ভাবে দাও না কেন।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাস

সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, এমন সময় আমার মনে হতে থাকলো যেন সুভাষ আসছে। যে পথে ধর্ম্মশালায় ফেরার কথা, সে পথ ভুলে আর একটি পথের মোড়ে এসে দেখি সশরীরে সুভাষচন্দ্র হাজির। আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে রইলাম—অধ্যাপক দত্তগুপ্ত নির্ব্বাক হয়ে রইলেন।

হরিদ্বার থেকে এক্কা চড়ে ঋষিকেশ দেখতে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম লছমণ ঝোলায়। গঙ্গার স্রোতের কি জোর—আর জল যেন ঠাণ্ডা বরফ! প্রাণভরে স্নান করা গেল। একটা ছত্রে এসে পুরী তরকারি প্রসাদ পেয়ে আবার ফিরলাম হরিদ্বারে।

হরিদ্বার থেকে ফিরে চললাম দিল্লীতে। দিল্লীতে তখন কি গরম। ছাদে জল ঢেলে, গায়ে জল দিয়ে, কলসী কলসী জল খেয়ে শুয়েও ঘুম আসে না। অধ্যাপক দত্তগুপ্তের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা দিল্লী ছেড়ে গেরুয়া প'রে মথুরা বৃন্দাবন দেখতে চললাম।

মথুরায় এসে এক ধর্ম্মশালাতে গেলাম—কিন্তু বাঙালী বলে

স্থান পেলাম না, কারণ বাঙালীকে স্থান দিলে পুলিশ পেছনে লাগে। এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে এক ভীষণ অন্ধকার অপরিষ্কার অট্টালিকার ত্রিতলগৃহে জায়গা পেলাম। আমাদের পকেট তখন গড়ের মাঠ। ছ'আনা দিয়ে কিনে একটা বড় তরমুজ খেয়ে ২ দিন কাটিয়ে দিলাম। একটা মর্কট এসে ঘরের ভিতর থেকে সুভাষের ক্যাম্বিসের জুতোর একপাটি নিয়ে গেল। ওখানকার সকলে বললো, কলা খেতে দাও, জুতো ফেরৎ দেবে। বাস্তবিকই তাই হলো।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর কথা শুনে যমুনার ওপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আগে সরকারী চাকরি করতেন, এখন সন্ন্যাস নিয়ে এক ক্ষুদ্র গৃহে বাস করছেন। সেখানে যোগচর্চ্চা ও শাস্ত্র অধ্যয়নাদি করেন। তাঁর সঙ্গে ধ্যানযোগ, কর্ম্মযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি কথা হ'ল—অনেক নতুন কথা শেখা গেল।

সন্ধ্যায় ফিরে দ্বারকানাথের আরতি, কংসের নিধনস্থান প্রভৃতি দেখলাম।

মথুরা থেকে আমরা চললাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে নামতে এল মুষলধারে বৃষ্টি। রাস্তার ধারে একটা প'ড়ো ঘরে আ নিলাম। একজন বাঙালী ভদ্রলোক ল্যাণ্ডো ও জুড়ি যাচ্ছিলেন। বৃন্দাবনে বাঙালীদের থাকবার জা কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সাদরে আমাদের নিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চললেন। প

পাবনা—তাড়াশের জমিদার পরম ভাগবত রাজর্ষি বনমালী রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।

হরিদ্বারে গুরুকুল দেখা হয়নি। এখানকার গুরুকুল দেখলাম। প্রায় একশত ব্রহ্মচারী শিক্ষালাভ করছেন। অনেকটা জায়গা ঘিরে আশ্রম করা হয়েছে। ছোট ছোট কুঠরীতে ছাত্রেরা থাকে। ফুল বাগানটি সুন্দর। যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব এই বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তি স্থাপনা করেন। তাই আগেকার রাজনীতির আড্ডা গুরুকুল এখন গবর্ণমেণ্টের আদর লাভ করেছে। বৃন্দাবনে ঋষিকুলেরও একটি শাখা আছে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত প্রেমমহাবিদ্যালয় নামক শি- বিদ্যালয়টিও দেখলাম।

পাণ্ডার ভয়ে বৃন্দাবনে ঠাকুর দেখিনি। কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে আমাদের ভক্তি অনেক আগেই চটে গিয়েছিল।

বৃন্দাবন থেকে এক্কা চ'ড়ে ১২।১৩ মাইল দূরে কুসুম সরোবর দেখতে গেলাম। এক্কাওয়ালা গান গাইতে লাগলো— "রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন,— মধুর মধুর বংশী বাজে ই তো বৃন্দাবন।" সুদূর পশ্চিমে খোট্টার মুখে এই ংলা গান শুনে আমাদের বড়ই ভাল লেগেছিল। এদেশের 'গুলি দেখতে সুন্দর। জার্ম্মাণির যুবরাজ নাকি ভারত সে মথুরার এক্কা একখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সরোবরে তিন দিন ছিলাম। মহারাজ সিন্ধিয়ার বৈষ্ণব চিরব্রহ্মচারী সৌম্যমূর্ত্তি হরিচরণ দাস হ'য়েছিলাম। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড নামক

পুণ্য সরোবরদ্বয় ও গোবর্দ্ধন গিরি দেখলাম। কুসুম সরোবর ও নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক 'বিরক্ত' বৈষ্ণব বাস করেন। এঁদের অনেকে আকৌমার ব্রহ্মচারী—সামান্য কুটিরে থেকে কাঁথা ও কম্বল সার করে দিনান্তে ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যে জীবনধারণ করে ভগবৎ ভজনে কাল কাটান।

এই সাধুগণের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের দুজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। একজন মথুরার জগদীশ বাবাজী, আর একজন কুসুম সরোবরের রামকৃষ্ণদাস বাবাজী। রামকৃষ্ণদাস বাবাজীর আনন্দময় মূর্ত্তি, মুখে হাসি লেগেই আছে, হৃদয়ও অসীম ভাবরসের আধার, কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। তিনি পার্শী, ইংরেজী এবং সংস্কৃত জানতেন।

সুভাষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ যাই হোক না কেন একটা ধরে সাধনা কর, সকল ধর্ম্মই সত্য, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক। তবে পথ বিভিন্ন।

ধরণীদাস বাবাজী নামে আর একজন সাধুর সঙ্গলাভ করেছিলাম। ইনি বাঙালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বড় সরলপ্রাণ, হৃদয়টি ভালবাসায় ভরা।

এখানে মৌনীবাবা নামে আর একজন মহাত্মা ছিলেন। তিনি দশবছর কথা বলেন নি। গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাজর্ষি বনমালী বৃন্দাবন থেকে মোটরে ক'রে কুসুম সরোবরে এলেন।

আমরা সকলে এক সঙ্গে খেতে বসলাম। পাতায় ভাত ও মাটির ভাঁড়ে জল খেতে দেওয়া হ'ল। খাওয়ার পরে সকলেই নিজহাতে এঁটোপাত ফেললেন ও জায়গা পরিষ্কার করলেন। বনমালী বাবুও করলেন। আমাদের চোখে এত বড়লোকের এই আচরণ নতুন বোধ হ'ল—বৈষ্ণবধর্মের এই সমভাব খুবই ভাল লাগলো।

সকালবেলায় বনের মধ্যে কীর্ত্তন হচ্ছিল। সকলেই মাটির উপর বসেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর কথা সুদূর বনমধ্যে কীর্ত্তিত হওয়ার সময় আমাদের মনে গৌরব-মিশ্রিত এক ধর্ম্ম-ভাব খেলে যাচ্ছিল।

এখানকার অহিংসার ভাব আমাদের বড় ভাল লেগেছিল কত সুন্দর সুন্দর হরিণ নির্ভয়ে মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে ময়ূর-ময়ূরী কেকারব ভুলে নৃত্য করছে, সরোবরে মাছ কচ্ছপ প্রভৃতি ভিড় করে মানুষের হাত থেকে খাবার নিতে আসছে।

নীল গোবর্দ্ধনগিরি দেখে কত না ভাবের উদয় হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ নাকি হাতে ক'রে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন তাঁর কালীয়দমন লীলার কথা আমাদের প্রাণে বিস্ময় জাগাতো।

কয়েকদিন রামকৃষ্ণ দাস বাবাজীর নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র চর্চ্চা করার পর তিনি আমাদের তার্কিক সুলভ মনোভাব দেখে উপদেশ দিলেন ভক্তিমার্গ আমাদের জন্য নয়—কাশীতে গিয়ে বেদান্ত-চর্চ্চাই ভাল।

বনমালী বাবু আমাদের কাশীর টিকিট করে দিলেন।

যাওয়ার পথে আগ্রা হয়ে চললাম। আগ্রায় গিয়ে অতিথি হলাম সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ বাগচির বাড়ীতে। বাগচি গৃহিণী আমাদিগকে পরম আদর যত্নে নানা উপচারে খাওয়ালেন। এই মহিয়সী-মহিলা বেদ বেদান্তে পারদর্শিনী আবার গৃহকর্ম্মে দ্রৌপদীতুল্যা ছিলেন। এঁদের অতিথি সংকার ঐ অঞ্চলে সুবিদিত। এই বাড়ীতে স্বামী প্রেমানন্দ নামে একজন গ্রাজুয়েট বাঙালী সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়। স্বামীজী অতি মিষ্টভাষী ও প্রেমিক ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন।

বিকেলে আমরা স্বামীজীর সঙ্গে মমতাজমহলের পিতার সমাধি মন্দির ইৎমৎউদ্দৌলা দেখতে গেলাম। আগা গোড়া নানা কারুকার্য্যচিত, শ্বেত পাথরে তৈরি এই সুন্দর সমাধিটির শিল্পচাতুর্য্য ও শান্ত সৌন্দর্য্য দেশী বিদেশীর প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। এই স্থানের একটি ছোট ছেলের হাতে পয়সা দিলাম। কার ছেলে জিজ্ঞাসা করতে সমাধি-রক্ষক উত্তর দিল, ‘পরমাত্মাকা লেড়কা।” এই দরিদ্র পিতা নিজের ছেলেকে ভগবানের বলে মনে করে। এ কেবল ভারতেই সম্ভব।

পরদিন সাজাহানের সাধের তাজ দেখতে গেলাম। ভিতরে একটি জায়গায় সম্রাট ও তাঁর প্রিয় মহিষীর সমাধি পাশাপাশি রয়েছে। সেখানে লেখা আছে—“হে দর্শক, এখানে তোমার পদধূলি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর।”

বিকালে আগ্রার দুর্গ দেখলাম। দুর্গের বাইরে একস্থানে

পাথরে তৈরি একটা ঘোড়ার মুখ আছে। বীরবর অমর সিংহ শত্রুর হাত থেকে দুর্গরক্ষায় অক্ষম হয়ে অত্যুচ্চ দুর্গপ্রাচীর থেকে ঘোড়াশুদ্ধ নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। প্রভু-ভক্ত অশ্বের দেহ মাটিতে গলা পর্য্যন্ত পুঁতে গিয়েছিল—কিন্তু প্রভু নিরাপদে পালাতে পেরেছিলেন।

দিল্লীর চেয়ে আগ্রার দুর্গ অনেক বড় এবং শিল্পসম্পদে গরীয়ান। জাঠ ও মারাঠা প্রভৃতির আক্রমণে এর সম্পদ অনেকটা লোপ পেয়েছে। ইংরেজের সৈন্যদের ব্যারাকে দুর্গের মধ্যস্থল কুরূপ হয়েছে।

আগ্রা ছেড়ে চললাম বারাণসীতে। আমরা আগ্রার স্বামী প্রেমানন্দের কাছ থেকে আসছি শুনে রামলাল বাবু নামে এক ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে গিয়ে অনেক আদর যত্ন করলেন। সংসার ত্যাগ করে রামলাল বাবু কাশীতে ধর্ম্মজীবন যাপন করছিলেন।

পরদিন গেলাম "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" দেখতে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করলাম। সুভাষকে স্বামীজী আগে হতেই চিনতেন এবং তার বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। স্বামীজী আমাদের আশ্রমে এসে থাকতে বললেন। স্বামীজী সাধারণতঃ "রাখাল মহারাজ" নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রেমময় হৃদয়ের পরিচয় প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করতাম। বালক বলে তিনি আমাদের কতই না যত্ন নিতেন, কত উপদেশ দিতেন, আমরা অবাক হয়ে শুনতাম।

সেবাশ্রমটি বৃহৎ, অতি সুন্দর—কার্য্যপন্থাও উৎকৃষ্ট।

এখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী থেকে দারিদ্রনারায়ণ আর্ত্তের সেবা করছেন। স্বামী শঙ্করানন্দের সঙ্গে অনেক আলোচনা হ ল। তাঁর মতে শিক্ষা প্রচারের দ্বারাই ভারতের উন্নতি হবে। স্বামী অম্বিকানন্দ বড় রসিক ছিলেন—সদানন্দ এবং কিঞ্চিৎ তামাকু-ভক্ত। হুঁকোয় ক'রে তামাক টানতে টানতে হাসতে হাসতে বললেন - দেখ সকল সৃষ্টির আগে ব্রহ্মা এই হুঁকো কল্কের সৃষ্টি করেন। কারণ পঞ্চভূতের সম্মিলিত তত্ত্ব একমাত্র এই অপূর্ব্ব পদার্থে বিদ্যমান। ক্ষিতি হ'ল কল্কে, অপ্—হুঁকোর জল, তেজ—আগুণ, মরুৎ—ফুরুৎ ফুরুৎ ক'রে টানবার সময়কার হাওয়া, ব্যোম—জলভরার পর খোলের ভিতর যেটুকু ফাঁক থাকে!

কাশীর থিয়োসফিকাল সোসাইটি, হিন্দু-কলেজ, ভাস্করানন্দ স্বামীর আশ্রম, দুর্গাবাড়ী, দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারসী শাড়ীর কারখানা, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির দেখলাম। কাশী থেকে গেলাম সারনাথ দেখতে। ভগবান বুদ্ধ সারনাথে তাঁর সাধনালব্ধ অমৃতময়ী বাণী সর্ব্বপ্রথম সাধারণকে শোনান। সারনাথের বৌদ্ধস্তূপটি অত্যাশ্চর্য্য ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে।

সারনাথ থেকে আমরা স্থির করলাম বোধগয়া যাবো। বোধগয়া গিয়ে মোহান্ত মহারাজের প্রাসাদে অতিথি হ'লাম। মহারাজ খুব আদর যত্ন করলেন। রূপো দেওয়া ঘোড়ার সাজ, সেই ঘোড়ার জুড়ি গাড়ী চ'ড়ে, মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। হাতী, ঘোড়া, লোকজন, সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য রাজা মহারাজকেও হারিয়ে দেয়।

বদ্রুমতলে সুভাষ গিয়ে ধ্যানে বসলো। এই বৃক্ষতলে সে শাক্যসিংহ সঙ্কল্প করেছিলেন

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রনয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মত শ্চলিষ্যে।"

দুপুরে ভীষণ গরম। মহারাজের জন্য মিছরি দিয়ে সিদ্ধির সরবৎ তৈরি হচ্ছে। আমাদের খেতে বললেন। আমরা সিদ্ধি খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে দুপুরে রোদের মধ্যেই হেঁটে রওনা দিলাম। বাইরে তখন লু চলছে।

তিনদিন বোধগয়ায় থাকার পর বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের জন্য জলের কুঁজো বগলে, বিনা ছাতায় ৬ মাইল হেঁটে গয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম।

পাথরের শ্রীপাদপদ্মদর্শনে আমাদের পাষাণ-হৃদয় গললো না। পণ্ডিত নিমাই, তার্কিক নিমাই এই পাদপদ্ম দর্শনেই প্রেমিক নিমাই হন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়িয়ে যিনি আঠারো বছর কাল অশ্রুবিসর্জ্জন করেছিলেন, পূর্ণিমার রাতে তরঙ্গায়িত নীলসমুদ্র দেখে যমুনাভ্রমে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন—শ্রীপাদপদ্মের সহিত তাঁর জীবন-স্মৃতিই আমাদিগকে উদ্বেল করে তুলেছিল।

সারা ভারত ভ্রমণ করে গুরুলাভ হল না। কাশীতে থাকতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপদেশ দিয়েছিলেন বাড়ী ফিরতে, কারণ আমাদের মন তখনও সন্ন্যাসের জন্য তৈরী হয় নি।

সুভাষের নামে বাড়ী থেকে পুলিশে হুলিয়া করা হয়েছিল। গণক দিয়ে গণনা করা হয়েছিল। সে পশ্চিমে কোথাও আছে এবং সঙ্গে আরও দুজন আছে—সন্ন্যাসে বাধা আছে, নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরবে। বাড়ী ফিরতেই বাবা আলিঙ্গন দিয়ে ছেলেকে টেনে নিলেন—মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছেলের নিষ্ঠুরতার কথা বললেন।

আর আমি ছিলাম—'লা-ওয়ারিশ'—বাড়ী থেকে গেলাম কি এলাম, সে খবর বড় একটা কেউ রাখতো না। সন্ন্যাস জীবনের এইখানেই আমাদের ফুলিষ্টপ হ'ল!

সন্ন্যাসের পর

সন্ন্যাস থেকে বাড়ী ফিরে সুভাষ আমায় একখানা চিঠি লিখল। চিঠিখানা এই :—

৩৮/২, এলগিন রোড, কলিকাতা
বৃহস্পতিবার বৈকাল
১৯-৬-১৪

ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। সত্যেন মামা ও একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তারা একটু আশ্চর্য্য হইল। ভিতরে পিসে মহাশয় দাদা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হ'ল। মার কাছে খবর গেল। অর্দ্ধেক পথে তার সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রণাম করিলাম

—তিনি দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন পরে এইমাত্র বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম আমি এতক্ষণ থাকিতাম না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম, কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য।' আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া যখন কাঁদিতেছিলাম তখন আমার মনে হইতেছিল শুভ্র জ্যোৎস্না মধ্যবর্ত্তী সেই মুখখানি—যাহার জন্য সব ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি—সব পারিয়াছি—কিন্তু শরীর মন পারি নাই। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন, আমি ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত frankly বলিলাম—টাকার কথা বলিলাম। তোমার কথা তাঁহাদের কাছে বলিবার আবশ্যক হয় নাই তাই বলি নাই—মামা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছি। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেবল বলিলেন, একখানা চিঠি দাও নাই কেন?

নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা active ছিলেন বাবা passive, কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয় না, একজন পুলিশ কর্ম্মচারী relative বারণ করেছিলেন। মা পাগল প্রায়—আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইব—তাই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা

প্রত্যাগত) চলিলেন, আমার অনুসন্ধানে—বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পঁহুছিয়াছে—তাহার মর্ম্ম শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা।"

বেলুড়ে খোঁজ করা হইয়াছিল—হরিদ্বার Ramkrishna missionএ wire করা হইয়াছিল—negative reply.

Howrahর একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলেন ফিরিয়া আসিবে ১৯।২০ দিনের ভিতর—ভাল আছে একলা নাই—সঙ্গে দুইজন আছে—উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া কোন স্থানে আছে, তখন বোধ হয় আমরা বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন Contrary influence-এর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না—সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি! তিনি কচুপোড়া জানেন!

সকলের মধ্যে রণেন মাতুল খুব favourable, সত্যেন বলেন, most obedient হও—তার জীবনের ideal যেন তাই। আর বিশেষ কেউ কিছু বলে নাই। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি reasonable. তিনি বলেন boldly বলে কয়ে talk the matter over and then be a sanyasi, কে তোমার পথে বাধা দিতে পারে?

দুপুরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া সন্ন্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে,

বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার idealটা বলিলাম। সমস্ত discussionএ what he wanted to drive at was—

(১) সংসারে থেকে ধর্ম্ম হয় কি না (২) ত্যাগের জন্য preparation দরকার (৩) কর্ত্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক ? আমি বলিলাম (১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয় কারণ সকলের এক রোগ এক সামর্থ্য নয় (২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা অনেকটা নির্ভর করে—সকলের জন্য বেশী ঘষা-মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে (৩) কর্ত্তব্যটা relative—higher call এলে lower calls ভেসে যায়—জ্ঞান এলে কর্ম্ম নাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্বৈত জ্ঞান "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" একটা theory কি না। যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ theory কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise করা যায়। যাঁহারা এ কথা বলে গেছেন তাঁহারা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমরাও realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন "কারা করেছিলেন এবং প্রমাণ কি ?" বলিলাম 'ঋষিরা'— প্রমাণ বেদাহমিতি এই বলিয়া শ্লোকটা quote করিলাম। তারপর বলিলেন এক সময়ে কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও পরমহংস দেব ছিলেন—যে যে রকম পেরেছিলেন সেই রকম হয়েছিলেন। আমি বলিলাম বিবেকানন্দের ideal হচ্ছে আমার ideal.

শেষে বলিলেন, আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব।

আমি এতদিন বাবাকে actively oppose করি নাই—passively I have won the victory এখন তিনি জোর করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারেন না এবং next time চলিয়া গেলে বোধ হয় ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন।

যাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি। মা fanatic, বলেন, আর যদি ও যায় আমি আর থাকিব না—সঙ্গে সঙ্গে যাইব আর ফিরিব না। তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়, বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable.

বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে।

বেণীবাবুর বিষয়ে সকলের ভাল ধারণা এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। বেণীবাবু বেশী কিছু বলেন নাই—সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন এবং আমার কৃচ্ছ্র সাধন – তোমাকে মোটেই জড়িত করেন নাই। এখানে আবার মানুষটাকে জানা যায়।"

দিন কয়েক পরেই সুভাষ এল কেষ্টনগরে আমার কাছে। আমাদের বাড়ীতে প্রথমে তার স্থান হ'ল না। বাইরের যে ঘরটায় আমরা থাকতাম, দেখি সেটায় তালাচাবি আঁটা। অগত্যা সুভাষকে নিয়ে উঠলাম গোয়াড়ী নিকারি পাড়ায় একটা মেসে। এখানে নীলমণি সেনগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র থাকতেন। এই বাড়ীটা গোয়াড়ীর ডাক্তার দামোদর চক্রববর্ত্তী মশায়ের ছিল।

টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত

ভীষণ গরমে দেশভ্রমণের অনিয়মে সুভাষের শরীর ভেঙে পড়েছিল। কৃষ্ণনগরে সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হ'ল। আমাদের বাড়ীতে এনে ওঠালাম ও দিনরাত সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলাম। রোগ একটু কঠিনরকম দেখে সুভাষের বাড়ীতে চিঠি দিয়ে জানালাম। শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছিলে সুভাষের ন'দা শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র বসু এসে তাকে নিয়ে গেলেন। ৬৩ দিন জ্বর ছিল, একবার ছেড়ে পাল্টে আবার আসে। এই সুদীর্ঘ অসুখের মধ্যে সুভাষকে দেখতে ব সেবাশুশ্রূষা করতে আমার স্বভাবতঃই খুব ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু বোস বাড়ীতে দরোয়ানের ওপর হুকুম হয়েছিল আমি ঢুকলেই যেন অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দেওয়া হয় সুভাষ এই নিয়ে খুব রাগারাগি করতো, বলতো বাড়ী ছেড়ে হাঁসপাতালে চ'লে যাবো। সেই রুগ্ন অবস্থায়ও দু'বেলা দুখানি চিঠি দিয়ে জানাতো কেমন আছে। পরে একদিন আমায় লিখলো কৃষ্ণনগর থেকে এসে তাদের বাড়ীতে দেখা করতে। আমি অর্দ্ধচন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে চোরের

মত ঢুকে দেখি, সুভাষ উপরের বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে দরোয়ানরা আমায় কিছু বললো না। তার ডাকে সটাং উপরে গিয়ে উঠলাম। তার কাছে কয়েক মিনিট থাকার পরই অভিভাবকেরা জানিয়ে দিলেন, মেডিক্যাল য়্যাডভাইস অনুসারে আমার আর সুভাষের সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না। আমি অগত্যা উঠতে বাধ্য হ'লাম। সুভাষের মনোভাব সম্বন্ধে এই সময়-কার কয়েকখানি চিঠি উদ্ধৃত করলাম ;—

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা।

১৮।৭।১৪

শনিবার বেলা ১১ টা।

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম। কালকার পত্রে বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছি যে বাপ মা প্রভৃতি সোমবারে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিবেন। তুমি আবার এসো—কারণ এর পরে বাড়ী পূর্ণ হইলে দেখা করিবার তেমন সুবিধা হবে কি অসুবিধা হবে ঠিক বুঝিতেছি না। রবিবারে যখন ইচ্ছা হয় এসো—He is always a personality সে শারীরিক উপস্থিত না থাকিলে তার invisible presence সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহার মঙ্গলময় ইচ্ছা সর্ব্বদা আমাকে ভালর দিকে লইয়া যাইতেছে।

সেবা soul এর দ্বারা হচ্ছে—অদৃশ্য ভালবাসার দ্বারা হচ্ছে। তুমি কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে আমার কত আনন্দ। আচ্ছা তুমি কি পরশু রাত্রে ভাত খাও নাই?

তুমি বেশী কষ্ট করিও না,—তোমার সেবা কি সাধারণরূপে আসিবে তার মঙ্গলময় • ইচ্ছা সে সেবা তার ভালবাসা—আর কি লিখিব—তুমি বুঝিতেছ, আমি বেশ আছি, কাল minimum সকালে 97 হইয়াছিল এবং রাত্রে maximum 100'2, আজ minimum 97'4, আমি ভাল আছি, তুমি চিন্তিত হইও না। কথা সাক্ষাতে হবে। রবিবারে সকাল থেকে বৈকাল বা রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতে পার—কার সাধ্য কিছু করে—তুমি একলা আসিলে বোধ হয় ভাল হয়।

৬।৮।১৪

বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা

তোমার মঙ্গলবারের লিখিত চিঠি আজ হস্তগত হইল। খামের উপর দেখিলাম সমস্ত চিহ্ন যে খাম খোলা হয়েছিল এবং পাঠান্তর পুনরায় বন্ধ করা হয়েছিল।

প্রথমতঃ খামের উপর জলের দাগ, দ্বিতীয়তঃ টিকিট তোলা হয়েছিল তার চিহ্ন, তৃতীয়তঃ টিকিটের উপর কালির দাগ (বোধ হয় হাতে কালি লেগে গিছল)—চতুর্থতঃ টিকিটের ছাপ এবং খামের উপর ছাপ coincide করছে না—শেষে খামের উপর কালি লেগে গিছল। * * * তার উপর বাতি ঘসা হয়েছিল—যাহাতে টের না পাই। এই পাঁচটা প্রমাণ পেয়েছি। তুমি যখন মঙ্গলবারের চিঠি post কর তখন খামের উপর কি এইরূপ কোন চিহ্ন ছিল? পত্রপাঠ ইহার উত্তর দিবে। যেন ভুল না হয়।

এ ডাক্তারের advice গ্রাহ্য করি না—কিন্তু ও ডাক্তারের

advice সর্ব্বথা শিরোধার্য্য। তোমার দয়া—সব তোমার দয়া—ইহা যেন চিরকাল বুঝিতে পারি।—দাদা সঙ্গে কি বচসা হইল তা প্রায় মনে নাই—* * * তিনি বুঝিলেন he has caught a tartar in me. বলিলাম, "যতদিন তোমাদের কাছে আছি ততদিন তোমরা এ ক্ষমতাটা ব্যবহার করবে, কিন্তু চিরকাল তোমাদের কাছে থাকছি না।" আমার শরীরের কথা বলিলেন, বলিলাম, "তার জন্য আর কেহ দায়ী নহে, আমি দায়ী এবং আমি ভুগিব—আর কেহ ভুগিবে না। তোমার কিছু বলিবার নাই"—আমি ত ভয়ানক চটে গিছলাম—রাগে কাঁপিতেছিলাম—প্রায় ঘণ্টা খানিক পরে মনটাকে ঠাণ্ডা করলাম। * * * আমার এ হেন শক্তি নাই যে তোমাকে ইচ্ছা হইলেও আর কিছুক্ষণ কাছে রাখি। এ পরাধীন অবস্থায় কি থাকা যায়?

প্রত্যেক পত্রে যেন তোমার শুভসংবাদ পাই। আমি আগেকার চেয়ে ঢের ভাল feel করছি।

আসিতে কোন বাধা নাই—অবশ্য আসিবে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিবে।

২১।৮।১৪

শুক্রবার বেলা ১. ৩০,

তোমার চিঠি আজ পেয়েছি। কাল কোন চিঠি পাই নাই, সেইজন্য কোন পত্র দিই নাই।

একটা বড় interesting ব্যাপার হয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যার পর আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐ চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে

যাহাতে ওরা পড়ে। কাল রাত্রে সকলে যখন খাবার পর ঐ ঘরে একত্র হয়—তখন যেন চিঠিটা সকলের সম্মুখে খোলা এবং পড়া হয়। আমি উপরে ছিলাম, গোলমাল শুনিয়া কান পাতিলাম, শুনিলাম ঐ বিষয় discussion হচ্ছে। Discussion বড়ই violent, সকলেই একেবারে ক্রোধান্বিত—আমার কাছে এসে কিন্তু কেউ একটি কথাও বলে নাই।—দাদা বুঝি চিঠিটা রেখেছেন। তাহারা যখন violence-এর highest pitch-এ তখন শুনিলাম—দাদা বলছেন—"হেমন্ত রবিবারে আসুক। হেমন্তকে দেখিব।" তাহার পর—দাদা তাহাদিগকে আরও sober হইতে বলিলেন, তাহারা চুপচাপ করিয়া উপরে আসিল।

যাহা হউক ব্যাপারটা বেশ interesting। প্রথমে মনে করিলাম তোমাকে এখানে আসিতে বারণ করিব, পাছে তোমাকে কেহ কিছু বলে। তারপর ভাবিয়া দেখিলাম যে তুমি যদি রবিবারে এখানে না আস, তাহা হইলে সকলেই আমাদিগকে কাপুরুষ ঠাওরাইবে এবং তাহাদিগকে যে গাল দেওয়া হয়েছিল, সে গালটা উল্টে আমাদের উপর চাপাবে। এ অবস্থায় তোমার এখানে না আসাটা অন্যায় হ'তে পারে। কারণ ভবিষ্যতেও তাহারা আমাদের উপর কাপুরুষ আখ্যা প্রদান করিবে। তাহারা মনে করিবে এবং বলিবে যে এতদিন আসিতেছিল, এবার আর ভয়ে আসিতে সাহস পাইল না—সামনা সামনি বলতে পারে না কাগজে কাপুরুষের মত লেখা হয়!

আমি জানি যদি কেহ তোমার সঙ্গে কোন বিষয় তর্ক করিতে আসে তাহা হইলে কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে না; আর এ দেহে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আছে কেহ কোন অন্যায় করিয়া পার পাবে না, তাহার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হ'লে সেত কত আনন্দের কথা। আমি কাল প্রতিজ্ঞা করিলাম—I shall see how I can defend my—যদি দরকার হয়। আমি অনুমান করিতে পারি সেদিন একটু বচসা হতে পারে—দাদা ভদ্রতা করে বলবে। আমার নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শক্তি—দরকার হয় আমি একা বাড়ীতে সকলের সঙ্গে লড়িতে পারি। আর আমার শক্তি বেশী এই জন্য যে কাহাকেও তিলমাত্র care করিনা—so long I was a sanyasi in disguise—now I am going to be a full-fledged sanyasi. এই বলিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব আনন্দের সহিত।

তুমি রবিবারে এখানে এগারটার থেকে বারোটার মধ্যে আসিও। আমি নীচে তার পূর্ব্ব থেকেই অপেক্ষা করিতে থাকিব। ভাবিবার কিছু দরকার নাই। যাহা করিবার বা বলিবার আমি করিব। I would have settled up the matter myself কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এ বিষয় আমাকে একটি কথাও কেহ বলিতে আসে নাই। সেদিন আসিলে আমি দেখিব। কিছুক্ষণ পরে আমি তোমার সঙ্গে মেসে. যাইব—কারণ অনেকদিন যাওয়া হয় নাই—যাইতে বড় ইচ্ছা করে।

এ ঘটনার বিষয় কাহাকেও বলিও না—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই, কারণ—দাদা বলিতেছিলেন যাহারা এত ক্রোধের বশীভূত তাহাদের spiritual culture কি হয় বুঝি না আমার সম্মুখে বলিলে বুঝিয়ে দিতাম anger এবং resentment-এর ভিতর তফাৎ আছে।

বেশ ভাল আছি—খুব energy. আশা করি তুমি ভালই আছ।

স্বাস্থ্য উদ্ধারে যাত্রা

জ্বর থেকে সেরে উঠে সুভাষ চেঞ্জে গেল কার্সিয়ংএ। স্থান পরিবর্তনে তার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হ'ল। মাস-খানেক থেকে সে কলকাতা ফিরে এল।

তারপর আমি পড়লাম অসুখে—ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়ায়। সুভাষ কৃষ্ণনগরে এল। ডাঃ অমূল্য উকিল কলকাতা থেকে এসে চিকিৎসা করলেন—সমস্ত গায়ে বরফ চাপা দিয়ে ১০৭ ডিগ্রি জ্বর ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর বোধ হয় কয়েকমাস আমার ৯৬ এর উপর টেম্পারেচার ওঠে নি! সেটা নবেম্বর মাস, ১৯১৭। সামনে টেষ্ট্ পরীক্ষা প্রিন্সিপ্যাল দয়া করে অব্যাহতি দিয়ে এলাউ ক'লেন।

পড়াশুনোর কথা এতদিন মনে ছিল না। সুভাষেরও সেই অবস্থা। তাড়াতাড়ি কিছু নোট যোগাড় করে সে আমায় পাঠিয়ে দিল। কোনও গতিকে দিন কতক পড়ে আমরা ফার্ষ্ট ডিভিসনে আই. এ. পাশ করলাম।

দলের মধ্যে ভাঙন

পরীক্ষার আগে আমাদের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত আসে। আমার প্রতি সুভাষের একান্ত অনুরক্তির ফলে আমাদের দলের অনেকের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা অস্বাস্থ্যকর। সুরেশদা এই মতে সায় দেন নি। আমাদের উপর তাঁর একটা মস্ত ভালবাসা ও বিশ্বাস ছিল। সুভাষকে নির্দোষ ব'লে একদল আমায় দোষী সাব্যস্ত করলেন। এ সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের কথা তাঁর "জীবন প্রবাহ" পুস্তক থেকে উদ্ধৃত না করে পারলাম না —

"২।১১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে যোগেন, নৃপেন প্রভৃতি মিলিয়া আমাদের ভাইদের জন্য একটি আড্ডা করিয়াছে। এখানেই অভয় আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। সূত্রপাত তিন নম্বরের মেসে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে হইলেও, সেখানে বহিরঙ্গ মেম্বারদেরই ছিলো আধিক্য। খোঁজ করিয়া

বুঝিলাম দলাদলির মূল কারণ সূক্ষ্ম হইলেও ব্যাপারটি বর্ত্তমানে খুবই স্থূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে প্রফুল্ল, নৃপেন, যোগেশ, গিরীশ প্রভৃতি—অন্যদিকে হেমন্ত ও সুভাষ। দোটানায়ও অনেক আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত প্রভাবে সাময়িক একটা মীমাংসা করিলাম বটে। কিন্তু দালানের ছাদের ফাটলের মতো দলে একবার বিরোধ দেখা দিলে, শত জোড়াতালি সত্ত্বেও, তার অবসান সম্ভব হয় না। ফাটল ক্রমশঃ গভীর হইয়া শেষে দালানকে চুরমার করিয়া ছাড়ে।"

হ'লোও তাই, আমি, সুভাষ, অরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন দল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর কতকটা বিপ্লবীভাবে স্বতন্ত্র ধারায় কাজ করে চললাম।

সুভাষচন্দ্রের লিখিত আমার নিকট এই সময়কার ৩ খানি পত্র উদ্ধৃত করে দিলাম :—

কটক

২৭।৩।১৫

তোমার চিঠি এই পেলাম। কি লিখিব? তবে এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, যাহা ঘটিয়াছে ভালই হইয়াছে। তবে এর জন্যই যা দুঃখ হয়—আর কিছু নয়। দেখা যাক কি হয়।

প্রথমতঃ আর ভালবাসা পেতে ইচ্ছা হয় না—জগতের কাছ থেকে তার oppositeটি পেতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ নিন্দা অপবাদ, অপমান লাঞ্ছনা ইত্যাদি—দ্বিতীয়তঃ যাহারা কেবল গুণানুসন্ধি তাহাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা না

পাওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ পেলে হয় ত কোন না কোনদিন ভাবের পরিবর্ত্তনের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভাইদের সম্প্রতি ব্যবহার দেখিয়া জগতের ভালবাসার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছে।

আমার অসুখের সময় বাড়ীতে যে একটু বচসা হয়েছিল সেই occasion বা connection-এ একজনের কাছে তোমার কিছু নিন্দা শুনিতে হইয়াছিল। তার মূলে আমার কত সাধ ছিল যে এ কর্ণদ্বয় যেন কখনও তোমার নিন্দা অপবাদ না শুনে। কিন্তু যে দিন থেকে বুঝিলাম, এ সংসারে থাকিতে গেলে যে আশা দুরাশা মাত্র। কোন লোক তাহা পারে নাই। জগৎ জানে কেবল নিন্দা করিতে ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্যের জীবনে ইহাই কেবল দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এ বুকটাকে আমার পাষাণ করিতে হইবে। নিজের নিন্দা প্রভৃতিতে আনন্দ বই আর কিছু হয় না—অন্ততঃ পূর্ব্বে না হ'লেও এখন সেইরূপ বোধ হচ্ছে, কিন্তু আর একজনের নিন্দা ত সহ্য হয় না, এবং সে যে কষ্ট পাইতেছে, ইহাই একমাত্র দুঃখের বিষয়।

বাস্তবিক একটা ভীষণ সমস্যা। After all, is a breach inevitable? কিন্তু এটা যেন না হয় তার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মহানের জন্য, বন্ধুর জন্য নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিতে হইবে—অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এমন সুন্দর একটা গঠনের ভিতরে যেন একটা breach না হয়। ভগবান মঙ্গল- -রুন, সর্ব্বোপরি সুরেশদার পরিশ্রম ও চেষ্টা কৃতকার্য্য ্যাপারটা আমার হাতে নয়। আমাদের হাতে

যতটা ততটা আমরা exert করিতে পারি এই পর্য্যন্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা থাকিলে আমাদের influence তাহাদের উপর কিরূপ হইবে, একবার দাগ পড়িলে সে দাগ কখনও মুছে যায় না। এর পরে একটা সুন্দর reconciliation কি possible, প্রথমতঃ তাহাদের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা অপনোদিত হওয়া দুষ্কর—আর হইলেও সে দাগ আর যাবে না। ভবিষ্যতে আমাদের influence অন্যান্য ভাইদের উপর insalutary হইবার আশঙ্কা থাকিলে বোধ হয় বাধ্য হয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটা কথা, যেখানে বিশ্বাস একবার টলেছে, ভীষণ ভাবে টলেছে—সেখানে ভবিষ্যতে কি অন্য গাঁথুনী টিকিতে পারিবে?

এখন কথা হচ্ছে এর সম্বন্ধে একটা যা হয় শীঘ্র হয়ে যাক। হয় একূল না হয় ওকূল। মোট কথা আমার—যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যাহাতে মনোমালিন্যটা ঘুচে যায়, কিন্তু এ ব্যাপারটা যতই দিন যাচ্ছে ততই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ, বোধ হয় এ বিষয়ে অনেককে জানান হয়েছে। তাহাতে breachটা এত widened হয়ে গেছে যে বলবার নয়।

মীমাংসাটা শীঘ্র হয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু সুরেশদা ত' পশ্চিমে যাচ্ছেন, শীঘ্র এখন কি করে হয়? যদি বাধ্য হই, তাহা হইলে আমাদের পৃথক করিতে হইবে। But our best and sincerest wishes will ever be with those whom we love and we shall ever pray. আর আমাদের idealটা একই কি না—কেবল একটা personal a

ষা মনোমালিন্য। আমি এতশীঘ্র হঠাৎ যে separation-এর কথা বলিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে পার—এবং separation-এর কথা কি করে তুলতে পারছি তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে পার। কিন্তু আমার এইরূপ বলিবার বা প্রস্তাব করিবার কারণ (১) অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে থাকার চেয়ে মরাই ভাল (২) অন্যান্য ভায়েদের উপর যদি আমাদের influence তাহারা insalutary মনে করে তাহা হইলে তাহাদের ক্ষতি না করিয়াই আমাদের সরে যাওয়া ভাল।

তারপর আমাদের কথা বলিবার কি কিছু প্রয়োজন আছে? Come what may আমি আমার খুঁটি ছাড়িতেছি না। আমি life এর failure বা success অন্যের চোখ দিয়া measure করি না- নিজের চোখ দিয়ে করি এবং আরও failure বা success-এর জন্য care করি না—provi- I am true to my ideal.

এখন কার কি রকম হৃদয়ের ভাব তাহা ত বলিতে পারি । It is not impossible that at least some of them ıy like to eliminate us. তাহারা মনে করিতে পারে যে minate করলে হয়তো integrity বজায় থাকিতে পারে। শ্য আমি তাহাদের বর্ত্তমান মনের অবস্থার বিষয়ে hypo- :sis করিতেছি মাত্র। সুরেশদা এখন between the rns of a dilemma—তাঁহার ভিতরের ভাব কি বলা শক্ত তবে আমার মত এই যে যদি এটুকু জানিতে পারি যে

elmination-ই তাহাদের ইচ্ছা, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৃথক হওয়া ভাল।

তারপর নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমাকে যতদিন অনুসরণ করিতে পারিব ততদিন 'কা চিন্তা।' আর এখন নিজের উপর বিশ্বাস খুব বেড়েছে। সংসারের স্রোতে ফেলে দিলে ডুবিব না বা স্রোতে ভেসে যাব না, এতটা বিশ্বাস আছে। I have faith in my intellectual power and I believe I am not narrow-hearted. এখন একটা কিছু করে যেতে পারিব সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। আর তোমায় বলিব কি? আর কিছু নেহাৎ না হয়—I want this consolation only that I have not shrunk from my ideal. আমি তোমাকে কি চক্ষে দেখি এবং একদিকে নিজের supreme self consciousness থাকিলেও তো- তুলনায় নিজেকে কি চক্ষেই বা দেখি সে বিষয় কিছু বাহুল্য।

দেখ, আমি আবার কি বলিব—'আমার লাগিয়া কলং বোঝা বহিতে তোমার সুখ'। তোমার ত্যাগের কথা বলিব চেষ্টা করা কেবল তোমাকে ছোট করা। নিজের যা বি দেবার সব দিয়েছ—তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—এখন তা উপর কলঙ্কের ভার আমার জন্য লইলে। জগৎ ভাল দিকটা মোটেই দেখিতে চাহে না—আমার যা কিছু অপরা তাহাতে তোমায় দোষী করেছি। তোমার উপর কত নিন্দা আরোপ করেছে। জগৎ যাহার জন্য তোমার নামের উং

কলঙ্ক লেপনের জন্য উদ্যত হইয়াছে, তাহার সহস্রাংশের একটি দোষে যদি তুমি দোষী হইতে, তাহা হইলে এতদিন ও শরীরে প্রাণ থাকিত না, যাই হোক, আমি এইমাত্র বিশ্বাস অবলম্বন করে রয়েছি যে সত্য একদিন প্রচারিত হইবে।

এপ্রিল মাসটা এখানে থাকিব। মধ্যে পুরী ভুবনেশ্বর যাইতে পারি এইমাত্র। মে ও June আমি কার্সিয়ং থাকিব। এখন শরীরটা একটু ভাল হয়েছে বোধ হয়। Kurseong এ দুই মাস থাকিলে শরীরটা খুব ভাল থাকিবে—আমার চেহারার এখন পূর্ব্বশ্রী ফুটে উঠেছে, এইরূপ বোধ করি।

বাবার সঙ্গে এপ্রিলের শেষে যাব। বৰ্দ্ধমান মহারাজার বাড়ী ঠিক হয়েছে।

কটক

৩।৪।১৫

শনিবার

আমার পত্র দুইখানি পেয়ে থাকিবে। পরশু এবং কাল এক খুব important ঘটনা হয়ে গেছে। এখন সব কথা খুলে লেখা অসম্ভব। তাছাড়া গিরীশ ও সুরেশদা আমায় নিতান্তই অনুরোধ করেছেন কিছুদিন পরে তোমায় বলিতে। একমাসের মধ্যে যখন কলিকাতায় যাব, তখন দেখা যখন হইবে তখন সব খুলিয়া বলিব। একটা খুব সুন্দর reconciliation হয়ে গেছে—গিরীশদা অনেকটা mediator গোছের হইলেন। সুরেশদা বলিলেন, I thought the relation

to be undesirable but not unhealthy. তিনি বলিলেন purity সম্বন্ধে একতিলও সন্দিহান কখনও আমি হই নাই। তবে তোমাদের exclusiveness এর জন্য এবং সকলের নিকট হইতে complaint পাইবার জন্য আমি খুব ব্যথিত হইয়াছিলাম। তাঁর মনে মনে আমাদের ব্যবহারের জন্য কিরূপভাবে কষ্ট দিন দিন grow করেছিল তাই বলিলেন—আমি যাহা কিছু বলিবার বলিলাম। গিরীশদার বিশ্বাস এবং তাঁহার চরিত্রে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বলিলেন বাঙাল যদি কিছু সন্দেহ করে থাকে, I will call him a liar to his face. যাহা হউক এখন all's well that ends well করিয়া ফেরা যাক। একটা জিনিষ আমরা ভুল করিয়াছি (এবং পরে এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে) আমরা realise করি নাই, আমাদের একটি কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী। ভাইদের উপর তাহার কত effect.

সুরেশদা বলিলেন, তোদের publicএর মধ্যে সমানভাবে মিশিতে হইবে, যাহাতে কেহ টের না পায় কে কাকে কত ভালবাসে।

১২।৪।১৫

শনিবার।

আমি অন্ধ আমার চোখ খুলে দে। আমি মূক—আমার মুখ খুলে দে—আমি বধির—আমার কান খুলে দে, যেন মর্ম্মে মর্ম্মে তোর ডাক নিয়ত শুনিতে পাই। আমার সংকীর্ণ হৃদয়টাকে বড় করে দে—আমার জ্ঞান প্রস্ফুটিত

করে তোল। আমায় ভাল করে দে—তোমার অমৃতময় স্পর্শে আমায় সোণা করে দে। কতদিন ধরে আঁধারের মাঝে আমার জন্য আলো নিয়ে দাঁড়িয়েছ—কিন্তু অন্ধ আমি যে আলো দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। কানে কানে কতবার ডেকে যাচ্ছ—কিন্তু বধির যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছে না। আমার এ আঁধার হৃদয় কি কোন দিন তোমার স্নিগ্ধ আলোকে আলো হবে না? Infinite patience নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অসীম তোমার দয়া কিন্তু আমার এ চিরনিদ্রা বুঝি আর ভাঙে না।

কত অপরাধ করেছি। কত শতবার অবাধ্য হয়েছি। কিন্তু কি করিব আমি যে অজ্ঞান অবস্থায় করেছি। কুষ্ঠ-রোগীর ঘার মত কত যুগ সঞ্চিত মলিনতা তুমি হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দ্বারা নিয়ত ধুইতেছ।

সুরেশদার ধারণা আমার বিষয়ে যে কি রকম তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার বিষয়ে clashing হইয়া আসিতেছে এবং এবারও হইল। আমি বলিলাম, আমি নিজের বিষয়ে এতটা জানি যে, সে চরণের এক ধূলিকণা হইবার যোগ্য নহি, এর চেয়ে দৃঢ় সত্য আমি জানি না। গিরীশদা বলিলেন এ বিষয় মীমাংসা অসম্ভব—বাঙ্গাল বাঙ্গালের ধারণা ছাড়িবে না—তুমিও তোমার নয়। সুরেশদা তোমাকে কোন কোন বিষয়ে আমার ছোট দেখে—যে নিয়ে বহুদিন যাবৎ আমার সঙ্গে একটা মতভেদ চলে আসছে।

যাক সুরেশদার ধারণা ছিল আমি বোধ হয় তার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়াছি—এবং সে রাগ এখনও বেশ আছে। আমি কিন্তু বলিলাম, জীবনে রাগ করা কাহার উপর আমার পক্ষে possible নয়। আমার রাগ at least নেকড়ার আগুন। আমি বলিলাম, ২/৩ occasion এ একটা রাগ অভিমান দুঃখ মিশ্রিতভাবে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও ক্ষণিক। বর্ত্তমানের কথা বলিলাম, এখন রাগ ত নাই—কাহার উপর আমি দোষ দিই না—দোষ দিই আমার ভাগ্যের উপর—আমার দুর্ভাগ্য না হইলে এইরূপ কখনও হইতে পারিত না।

সুরেশদা ও গিরীশদা তোমাকে কিছুদিন না বলিবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বটে কিন্তু আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হই নাই। তবে পত্রে সব লেখা possible নয়—তাই লিখিতেছি না—গিরীশদা অনুরোধ করেছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন, তোমার হয়ত খুব কষ্ট হবে and the shock may be too much for you. তিনি তখন জানিতেন না যে তুমি সব কথাই জান এবং তোমার হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানিতেন না, আমি সব বলিলাম।

যাক একটা ভয়ানক interesting ঘটনা হয়ে গেছে! আমার মুখ দিয়ে শুনিলে full details পাইবে না, ২।৩ জায়গায় আমার নিজের ভাব এবং attitude বর্ণনা করা আমার পক্ষে possible হইবে না।

আশুদার মুখ দিয়ে অনেক শুনিতে পাইবে আশা করি।

আমি মে মাসের গোড়ায় কার্সিয়ং যাব। বিধুর পত্র পেয়েছি। ওরা বোধ হয় Almora যাবে। বেলুড়ের কথা লিখেছে। সেখানে নাকি একটা জীবনের স্রোত এসেছে।

মিলিটারি ট্রেনিং

পূর্বেই সন্ন্যাসের উপর বিরাগ জন্মেছিল—তারপর এই 'সন্ন্যাসী'র দলের ব্যবহারে আমাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। তখন প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ ভীষণ ভাবে চলছে। আমরা সঙ্কল্প করলাম সৈন্য দলে ঢুকে মিলিটারি ট্রেনিংটা নিতে হবে—পরে দেশ স্বাধীন করার কাজে এটা কার্য্যকরী হবে। বহু বৎসর পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র কাজে পরিণত করেছিলেন, তার অঙ্কুর এই সময়েই উদ্‌গত হয়।

সুভাষের চরিত্রে অনেকগুলি বিরোধী ভাবের সমাবেশ ছিল। রক্ত দেখলে আমি মূর্চ্ছা যেতাম। কিন্তু সুভাষ অনায়াসে প্রাণি হত্যা করতে পারতো। কটকের মেসে সে ছুরি দিয়ে নির্বিকার চিত্তে মুর্গী জবাই করতো। পরবর্ত্তী জীবনে পুলিসের গুলি ভরা বন্দুকের সামনে আমি অনায়াসে বুক খুলে দাঁড়াতে পেরেছি—কিন্তু যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ডাঃ কে. এস রায় একটি রোগীর বুকে বড় ছুঁচ বসিয়ে lungs collapse

করছিলেন দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি। বোধ হয় আমাদের বংশের বৈষ্ণবী ধারা এর জন্য দায়ী। সুভাষের হৃদয়টা খুবই কোমল ছিল, কিন্তু লোকোত্তর পুরুষের চরিত্রের গুণ তাতে ছিল—"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি।"

আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে সুভাষ গেল কটকে। কটক থেকে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে সে থার্ড ইয়ারে পড়তে সুরু করল। আমি কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পড়তে লাগলাম।

জীবনের মিশন

জীবনের মিশন সম্বন্ধে সুভাষের একখানা পত্র উদ্ধৃত করলাম:—

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

৩১।৮।১৫

আমি যে প্রবন্ধ দিয়েছি তাহাতে আমার attitude indirct ভাবে প্রকাশ করেছি—I have described it a supreme and sublime indifference. আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা defenite mission আছে তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion. লোকে ভালমন্দ

বলিবে জগতের এটা রীতি but my sublime self-consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্ব্বলতা কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য সম্মুখে পর্ব্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার যে মন জ্ঞান থাকে না—সেইরকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission-এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud-selfconsciousness of one imbued with an idea.

যাক, আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিস চাই

(1) Embodiment of the past

(2) Product of the present

(3) Prophet of the future.

(1) I must assimilate the past history in fact all the past civilisation of the world.

(2 I must study myself—study the world around me—both India and abroad for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendeney of both the civilisation and therefrom to settle the

future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation—begin with India.

Is not this a grand idea ?

* * *

The more we lift our eyes heavenwards the more we shall forget all that was bitter in the past, the future will dawn upon us in all its glory.

কেমন আছিস সে সম্বন্ধে লিখিসনি কেন ? শীঘ্র পত্রের উত্তরে জানাবি কেমন আছিস ?

তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে—কবে দেখা হইবে ?"

রাষ্টিকেশন

ইংরেজী ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় সুভাষ এক মহা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলো। তাদের ইংরাজীর অধ্যাপক ওটেন হিন্দু হোষ্টেলে ছাত্রদের সভায় ভারতীয়দের সভ্য করার জন্য এদেশে এসেছেন এইরূপ ভাবের কথা বলেছিলেন। এতে চটে গিয়ে এবং পরে ক্লাসের কাছে যাওয়া আসার গোলমালে অধ্যাপক ওটেনের ব্যবহারে

ছেলেরা ঠিক করলো ওটেন সাহেবকে উত্তম-মধ্যম দিতে হবে। তখন জেম্‌স্‌ সাহেব কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ষ্টার্লিং, গিলক্রিস্ট্‌ প্রভৃতি আরও কয়েকজন ইংরেজ তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। কলেজের উপর তলার সিঁড়ি থেকে নামবার সময় জন কুড়ি ছেলে ওটেনকে বেদম প্রহার দিল। এই দলের নেতা বলে সুভাষ ও অনঙ্গমোহন দামকে সন্দেহ করা হ'ল। এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা ইন্‌কয়্যারি কমিটি বস্‌লো। তাতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। সুভাষের এই সময়কার লিখিত দুখানি পত্র উদ্ধৃত করলাম।

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

২৯।২।১৬

তোমাকে মধ্যে যে ২।১ দিন পত্র দিই নাই, তার কারণ এই, যে বিশেষ কোন সংবাদ ছিল না। আমার সম্বন্ধে চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধীর ভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

Syndicate-এ আবেদন করার দরুণ তারা এখন আমার বিষয়ে কোন হুকুম জাহির করিবে না—বোধকরি committee-র report প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে।

আজ committee-তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং পুনর্বিচার করেন। Committee এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে আমার মনে হয় ৩।৪ দিন আরও প্রফেসারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে তারপর

ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা গিয়ে সাক্ষ্য দিব। Committee-র scope খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত করিবে।

১। Relation between European & Indian Professors in Presidency College.

২। Relation between European Professors and Indian students.

৩। Relation between Indian Professors and Indian students.

৪। Cause of indiscipline leading on to the strike.

৫। Ditto leading on to assault.

Committe-র recomendation-এর উপর গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় Presidency College কে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজন মত নূতন নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোনরকম গণ্ডগোল না হয়। সুতরাং বুঝিতেছ ব্যাপারটা বড় গুরুতর। আশুবাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস ছেলেদের rights suffer করিবে না। Committee যদি আমাদের নির্দ্দোষী বলে কিংবা benefit of doubt দেয়, তাহা হইলে আমরা Syndicate-এ application করিব যাহাতে আমাদিগকে students of Presidency College বলিয়া re-instate করা হয়। যদি re-instate না করে তাহা হইলে transfer চাহিব। Transfer-এর অনুমতি পাইলে

অনায়াসে অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই তাহা আমি practically rusticated হইব। তবে এ রকম rustication এক বৎসরের বেশী করে না। খুব বেশী অপরাধ করিলে একেবারে rustication for life দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনা "ইতি"।

যাক্ আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে—বড়লোকের মহলে অন্ততঃ নামে আমাকে চেনে—আমি নির্দ্দোষী বলিয়া public-এর মধ্যে vast majority-র ধারণা—আশুবাবু নিজে আমার কথা জানেন—আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষী তাহা বড় weak—সুতরাং, আমার নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অন্ততঃ transfer পাব বলিয়া বিশ্বাস করি।

শেষে কিছু না হয় ত law suit আনা যাইতে পারে।

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা।

৬।৩।১৬

সোমবার

তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিন্তিত আছি। আমার পত্র পাও নাই কি? আমাদের পত্র intercepted হইতেছে। আমার শেষ পত্র বোধ হয় Committee-র সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার পরের দিন লিখেছি। শুনিয়া থাকিবে যে হোষ্টেল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কলেজ খুব সম্ভব ছুটির এদিকে খুলিবে না। আমাদের উপর Committee-র attitude ভাল বলিয়া মনে হয় এবং আশা করি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত না

করিলেও benefit of doubt দিবে। যাক্—এখন কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার চিঠিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

ওখানকার খবর দিও। বেণীবাবুর সঙ্গে একদিন কথা-বার্ত্তা হয়েছিল। তিনি ছেলেদের খুব গালাগালি করিলেন। এবং জেম্‌স সাহেবের সহিত খুব সহানুভূতি করিলেন।

তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ লিখিবে। আশা করি, উপযুক্ত যত্ন লইতেছ এবং আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না। শীঘ্র উত্তর দিও।"

সুভাষকে rusticated হতে হ'লো। কটকে নিজের বাড়ীতে এক রকম home interned হ'য়ে তাকে বৎসরখানিক থাকতে হ'ল। এই সময়কার কটক থেকে লেখা সুভাষের একখানা চিঠি উদ্ধৃত করে দিলাম:—

কটক

"পায়ের ঘা একরকম সেরেই গেছে—প্রায় দুইমাস কাল ডাক্তারী ঔষধের দ্বারা বিশেষ উপকার পাই নাই—শেষে নিমপাতা ও হলুদ বেটে দেওয়াতে সারিল। তবুও আমরা গৃহ ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাকে এত ঘৃণা করি।

Defence Force এর নিয়মাবলী ও বন্দোবস্ত আমার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। মাত্র তিন মাসের training-এই শেষ না করিয়া যদি continued service-এর বন্দোবস্ত করিত, তাহা হইলে ভাল হইত। যাক এখন বলে কোন লাভ নেই।

তোমার চিঠি কয়েকবার পড়ে দেখি, তোমার সঙ্গে অমত ত কিছু নাই—বরং সম্পূর্ণ মতই আছে। সুতরাং বৃথা একটা আলোচনা সৃষ্টি করা আমার পক্ষে গোঁয়ার্তুমী বা বোকামী হয়েছে। ক্ষমা করিস।

একটা কথা বলি—তুমি rusticated student-কে যে ভাবে দেখ সমাজ সে ভাবে দেখে না। তাহার ভিতরে potential যাহা কিছু থাক না কেন—উপযুক্ত লেজ সংগ্রহ না করিলে—সমাজ সহজে তাহার নিকট মাথা নত করিতে চাহিবে না। লেজ না থাকিলে আত্মপ্রতিষ্ঠার দেরী হয়। আমার সে লেজ নাই। * * লেজ না থাকিলে অবশ্য বারে বারে কাজ করিয়া গেলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। কিন্তু আমি লেজ সংগ্রহ করে কাজটা accelerated করিতে চাহি। আমার এইটুকু মাত্র বলার আছে।"

কিছুদিন পরে সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে কটকে গেলাম। কটক সহরে পৌঁছে দেখি সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ীর নিকটে একটা মাঠে নির্বিকার চিত্তে ব্যাডমিন্টন খেলছেন! এইখানে শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেনের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রিয়রঞ্জন পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ'য়ে বহুদিন কাজ করার পর ১৯৪২ সালের জাতীয় আন্দোলনে রাজবন্দী হন।

১৯১৭ সালের জুলাই মাস। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সুভাষ স্কটিশ চার্চ কলেজে থার্ড ইয়ারে

ভর্ত্তি হ'ল। কিছুদিন পরে ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে ঢুকে বেলঘরিয়ায় ট্রেনিংএ গেল।

প্রথম মিলিটারি ট্রেনিং

৫।৪।১৮

Y. M. C. A.
Calcutta University Infantry
Shooting Camp
Belghurria, E. B. Rly.

তোমার পত্র পেয়েছি। আমি Univ. Institute এ সেদিন যাই নাই। কারণ, সেদিন Campএ যাবার কথা ছিল— ডাক্তারের অমতে * * * Campএ যেতে পারি নাই। আমরা পরশু এবং সম্ভবতঃ ২।৩ সপ্তাহ এখানে আছি। আজ rifle practice আরম্ভ হইল। বেশ interesting লাগিতেছে। আমরা ২৪শে এপ্রিলের পূর্ব্বে ছুটি পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং তোমার কথিত দিবসে নৈশ বিদ্যালয়ে বার্ষিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতে পারিব না।

আমার শরীর ভালই আছে। এখানকার অন্যান্য খবর ভালই। তোমার শরীর কেমন আছে?

৩০।৪।১৮

কলিকাতা

মঙ্গলবার

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। গত শুক্রবার আমরা সকলে বাড়ী ফিরিয়াছি। শরীর ভালই আছে। বোধহয় vacation-এর মধ্যে আর কোন কাজ পড়িবে না—কারণ ছুটির মধ্যে কলকাতায় খুব অল্পলোকই থাকিবে। তবে ছুটির পর কি হইবে বলিতে পারি না। বোধহয় দিল্লীর মহাসভা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। Capt. Gray আগামী ১লা মে হইতে General I. D. F. এর ভার লইবেন। তাহাদের Training শেষ হইলে উনি recruiting এর জন্য বহির্গত হইবেন। অবশ্য তাহাদের training শেষ হইতে এখনও দেড় মাস বিলম্ব আছে।

আমাদের experienceটা মোটের উপর খুব pleasant এবং যাহা শিখিয়াছি তাহার দ্বারা সকলেই যে কিছু উপকার পেয়েছি তার কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনমাসের training-এর effect তত lasting হইতে পারে না এবং কোন জিনিষের লাভালাভ পাত্রাপাত্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

আমাদের experience-এর ভিতর romance বিশেষ কিছুই নাই, সেই জন্য কলকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে monotonus বোধ হইত। কিন্তু বেলঘরে থাকিতে যখন ঝড়বৃষ্টিতে তাম্বু ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪॥ টা পর্য্যন্ত continual firing চলিয়াছিল,

তখন কতকটা field service-এর মত বোধ হইয়াছিল। তারপর পাইখানা প্রস্তুত করা, দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে 'শান্ত্রী' পাহারা দেওয়া এবং সর্বোপরি night operationগুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বেলঘরে থাকিতে যে shooting competition হইয়াছিল—তাহাতে British instructorরা ছেলেদের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। শেষ কয়দিন Camp life খুব decent বোধ হইয়াছিল, তার প্রতি বেশ মায়া জন্মেছিল এবং Camp ছাড়িতে অল্পাধিক কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল।

কাল নীলমণি ও মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আজ আবার দেখা হইতে পারে। শুনিলাম তুমি নাকি এত পড়াশুনা করিতেছ যে কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার অবসর হয় না। তোমার বোলপুর যাওয়ার কি হইল? ছুটিটা কি গোয়াড়িতে থাকিবে না অন্যত্র কোথাও যাইবে? তোমার শরীরের সংবাদটা চাই।

আমি বোধ হয় কলিকাতায়ই থাকিব। তবে এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছে পুরীর দিকে যেতে। তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে।

আমার শরীর একপ্রকার ভালই আছে। পড়াশুনা এখনও আরম্ভ করি নাই। কলেজের Magazine এর জন্য Camp life সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিব। সেটা সম্পূর্ণ হইলে তোমাকে দেখাইব।

শীঘ্র পত্রোত্তর দিও।

পুনঃ—তুমি আমার উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—উন্নতি আমার কিছুই হয় নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমি private ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই যে Capt. Grayর আদেশে N. C. O. দের stripes কেড়ে নেওয়া হয় এবং nomination এর পরিবর্ত্তে by vote একটা fresh election হয়। সে সময়ে আমি (sick) absent ছিলাম। সুতরাং সমস্ত posts filled up হয়ে যায়।

আই. সি. এস পড়া

সুভাষ বি. এ. পরীক্ষায় ফিলজফি অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হল। ফার্ষ্ট হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শ্রীযুত সত্যেন ব্যানার্জি—ইনি পরে I. C. S. হয়েছিলেন। আমি ১৯১৭ সালের বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে ইউনিভার্সিটি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হই।

১৯১৯ সালে সুভাষ এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজির এম. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হল। আমি তখন থাকি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এক ইউনিভার্সিটি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেসে। একদিন দুপুরে এসে আমাকে ঘরে একলা দেখে দরজা বন্ধ করে দিল। একখানা মোটা বই খুলে দেখিয়ে সে বললো –

"জানো কেমন করে মেয়েদের ছেলে হয়? আমি মার কাছে জিজ্ঞাসা করে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, মেয়েদের নাই দিয়ে ছেলে বেরোয়। কিন্তু তা নয়। এই দেখো ছবি।" এই বলে সে আমায় পাঠ্য পুস্তক থেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। আমি ন্যাকা সেজে চুপ করে দেখতে লাগলাম, আর ভাবলাম এই বয়স পর্য্যন্ত সুভাষ শিশুটিই আছে, তার মানসিক পবিত্রতা ও ছেলে মানুষি আমাকে আরও মুগ্ধ করলো।

এম্ এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই—সুভাষের বাবা তাকে বিলেতে আই. সি. এস্. পড়বার জন্যে offer দিলেন। সুভাষ রাজি হ'য়ে আমায় ব্যাপারটা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখলো। আমি তখন কৃষ্ণনগরে। এম. এ. পরীক্ষা সামনে সেজন্য তৈরী হচ্ছি।

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

২৬।৮।১৯

আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ী থেকে একটা offer পেয়েছি—বিলাত যাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে—বিলাতে পৌঁছিয়া এখন কোনও ভাল ইউনিভার্সিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েকমাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম Civil Service পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা নাই। সকলে মত যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবরে

কেম্ব্রিজে বা লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের primary ইচ্ছা বিলাতে University Degree লাভ করা কারণ তাহা না হইলে Education line-এ সুবিধা করিতে পারিব না।৮ যদি আমি এখন বলি Civil Service পড়িতে যাইব না— তাহা হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাত যাত্রা প্রস্তাব তোলা থাকিবে।

ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত? তবে একটা গুরুতর মুস্কিল এই—যদি Civil Service পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই! তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইব। বাবা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত দিতে হইয়াছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলাত যাত্রায় রাজি হইয়াছি। তবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যদি শীঘ্র একবার কলিকাতায় আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। শুনিলাম তুমি ৪ঠা আসিবে। কিন্তু তাতে বড় বিলম্ব হয়।

সুভাষের সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হয়, তখন থেকেই আমরা স্থির করেছিলাম, পাশ করে আমরা চাকরি করবো না এবং পরে ঠিক করি সুভাষ আই-সি-এস ও আমি আই-ই-এস-এ ঢুকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাকরী মোহ-গ্রস্ত বাঙালীর সামনে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের

সেবা করবো। তাই সুভাষের বাবার প্রস্তাবে মত দেওয়াতে আমি তাকে সমর্থন করে চিঠি দিলাম এবং স্মরণ করিয়ে দিলাম—I. C. S. পড়তে আপত্তি কি? সে যখন পাশ করলেও ছেড়ে দেবে কথা আছে, তখন আর ভাববারই বা কি আছে?

৩৮।২ এলগিন রোড, কলিকাতা।

৩।৯।১৯,

এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম—তবুও মনকে আশ্বস্ত করিতে পারি নাই যে আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পত্র দিতে পারি নাই। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হইতেছি—যদি অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত যোগাড় ও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারি।

Letters of Introduction দরকার হইবে কিনা তাহা সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে ঠিক করিব। লেখাপড়া সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিবার দরকার আছে।

যাহা হউক তুমি এখানে আসিলে সে সব ঠিক হইবে। তোমার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার দরকার নাই, কারণ আমি ২।৩ দিন পায়ের উপরই থাকিব। তারপরে আশা

করি, অবসর পাব। তোমার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য একটু অসুবিধা হইল।

এ দিকে আমার এম্. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। দারুণ আমাশয়ে ভুগতে ভুগতে পরীক্ষা দিলাম। সুভাষ কলকাতা থেকে জাহাজে রওনা হ'ল। আমি পরীক্ষার জন্য তার যাওয়ার সময় উপস্থিত থাকতে পারি নি।

বিলাতের পত্র

বিলাত পৌঁছে সে আমায় চিঠি দিল :—

Fitz William Hall. Cambridge.

১২।১১।১৯

যাহাদের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই, তাহারা পত্র দিয়াছে অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। যাহা হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি এবং সেখানে আসিয়াছি। জনৈক বন্ধুর সাহায্যে কতকটা বি. এ-র result-এর দরুণ এবং কতকটা I. D. F. Service এর দরুণ স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকিবার স্থানের অভাব সত্ত্বেও সৌভাগ্য-বশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি।

আমার মৎলব আগামী বৎসর Civil Service পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি ১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম "Indian Majlis". সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তারা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—"Kingdom of youth" সম্বন্ধে।—Mr. Andrews বক্তৃতা করেন Indentured Labour System সম্বন্ধে এবং Fizi islandবাসী ভারতীয়দের কি কি অভাব বর্ত্তমান আছে। আমার আসিবার পূর্ব্বে তিলক মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন; ইণ্ডিয়া অফিস থেকে চেষ্টা করিয়াছিল বাধা দিতে, কিন্তু পারে নাই। এখানকার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাঁহার নরম বক্তৃতা শুনিয়া সকলে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

গত দুইদিন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, এখানকার জলবায়ু লোকদের উদ্যমশীল করে তোলে। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক লোকের ভিতরে সময় জ্ঞানটা বড় আছে এবং সব কাজে method আছে। আমার সবচেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে, সাদা চামড়ায় আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে।

এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে—এবং professor দের ব্যবহার অন্যরকম। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী দেখে মাথা নত হয়। তুমি কেমন আছ? পরীক্ষার ফল কি হইল? অতঃপর কি করিবে জানিবার জন্য চিন্তিত আছি। বিস্তৃত পত্র দিও। সুনীতিবাবু লণ্ডনে research করিতেছেন। আমি ভাল আছি। যুগলদা France এ আছেন।

Cambridge.

১৯।১।২০

সোমবার

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। আমার মনে হয় তুমি একসঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে মানুষের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় হয়—তার উপরে বইয়ের দোকান—এবং তার উপরে আরও কত কি? তুমি যখন বুঝিতে পারিতেছ যে শরীর দিন দিন দিন খারাপ হচ্ছে·········তখন এইরূপ আচরণের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করে না—তাহারা কিছুই করে না—আর যাহারা করে, তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং একদিনের ভিতরে সব কাজ করিতে গিয়া শরীর এবং সব হারাইয়া বসে। তোমার যখন পূর্ব্বেকার প্রস্তাব ছিল P.R.S এর জন্য চেষ্টা করা এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকতা করা, তখন বোধ

হয় দোকানের ব্যাপারে হাত না দিলে ভাল করিতে। মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা করে—তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—২।১ বৎসরে সম্ভবপর নয়। অতএব তোমার যদি কোন বাসনা থাকে দেশের কোন স্থায়ী কাজ করিতে—তবে তোমার এরূপভাবে কাজ করা উচিত—যাহাতে বহু-বৎসর ধরিয়া কাজ করার শক্তি থাকিবে। অবশ্য কোন-দিন কাহার যাবার ডাক আসিবে—কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু তা বলে আগে থেকে গলায় ছুরি দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করে কোন লাভ নেই। আমার লেখা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না। দুঃখের বিষয় তুমি বড় বেশী কাজ হাতে নাও এবং সময়ে সময়ে শরীর সমর্থ না হইলেও মনের জোরের দ্বারা সম্পন্ন কর। এরূপ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

২।৩।২০

Fitz William Hall, Cambridge

২রা মার্চ্চ ১৯২০

কয়েক দিন হইল তোমার পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দিই নাই। যখন সময় কম থাকে, তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাহাদিগকে দুই লাইনে লেখা যাইতে পারে।

সেদিন 'ভারতীয় মজলিসের' বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (guest)

হইয়ে এসেছিলেন। ওখানকার বিদেশী বন্ধুরাও কেহ এসেছিলেন। মিসেস রায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাস্তবিক কবে আবার ভারত রমণীবৃন্দ সমাজের শিক্ষাদাত্রীরূপে আসন গ্রহণ করিবেন? না জাগিলে ভারত মহিলা, ভারত কভুও জাগিবে না। যেদিন Mrs. Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল—সেদিন দেখিলাম, ভারতরমণীর আজও এমন শিক্ষা দীক্ষা, গুণ, চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় দিতে পারেন। তারপর লণ্ডনে ডাক্তার মৃগেন মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলাম ডাক্তার মিত্র moderate in Politics কিন্তু মিসেস মিত্র extremist—আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠল। তারপর "গিরীশদার মা"—মিসেস ধরের সঙ্গে আলাপ হয়—তিনিও extremist। এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চে সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারে না। এদেশে যে সকল ভারতীয় মহিলারা আসেন—আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে গভীর স্বদেশ প্রেমের উদ্রেক হয়, কারণ, মাতৃহৃদয় বড় কোমল ও গভীর।

যাক্, বাজে বকছি। গিরীশদার সঙ্গে দেখা হয়? তিনি কোথায় ও কেমন আছেন? দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। দোকানের অন্যান্য খবর কি? জগদীশ বাবু F. R. S. হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে labour leaderরা বলেছিলেন—"The

..ntry which can tolerate Amritsar massacres deserves it. Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর Land of Adoption-এ ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। Passage পাচ্ছেন না।

কম পরিশ্রম করিবে। শরীর ভাঙ্গিয়াছে আর যেন না ভাঙ্গে। এমন ভাবে কাজ করিবে যে ত্রিশ বৎসর একই ভাবে শক্তি না হারাইয়া কাজ করিতে পারিবে। বড় বেশী কাজ হাতে নিয়ে ফেলেছ—কাজটা ভাল হয় নাই।

কোন দিকে ভেসে যাচ্ছি জানি না। কোন তীরে গিয়ে উঠব তাও জানি না। তবে বিশ্বাস করি, তোমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ না হারাইলে পথভ্রষ্ট হইব না।

হাতের লেখা বোধ হয় দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আজ এই পর্য্যন্ত, যাক্, ওখানকার খবর লিখিও।

কেম্ব্রিজ

২৩।৩।২০

তুমি ষ্টেট স্কলারসিপ পেয়ে এখানে আসছ, শুনে সুখী হ'লাম। কোথায় ভর্তি হইবে সে সম্বন্ধে যাহা হউক শীঘ্র একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমার এখানে দরখাস্ত করা উচিত। তারপর টাকার সম্বন্ধে। তোমাকে Scholarship বাদে বাৎসরিক £ 50-এর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হয়ত দরকার না হইতে পারে—কিন্তু খুব সম্ভব দরকার হইবে। তারপর outfits এর কথা। শুনিলাম Govt. Scholarship এ outfits-এর জন্য কিছু দেয় না। আমার মনে হয় সবশুদ্ধ

outfits এ প্রায় ১০০০৲ টাকা পড়িবে—অবশ্য সমস্ত জিনিষ-পত্র নিয়ে।

তোমার প্রেরিত এম. এ-র তালিকা যথাসময়ে পেয়েছিলাম।

তোমার দীর্ঘ পত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দুইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি কাহাকেও বলি নাই, I. C. S. পাশ করিয়া বাংলা দেশে ফিরিব না।

তোমার পত্রের মোটের উপর সবই অনুমোদন করি। উত্তর দিতে গেলে প্রকাণ্ড উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং বুঝাপড়া হইবে। এখন থাক।

আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

সুভাষ ভেবেছিল এত অল্প সময়ের মধ্যে আই. সি. এস. পাশ করতে পারবে না, ওদেশের একটা ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু পাশ করলো, চতুর্থ স্থান পেলো এবং ইংরেজী কম্পোজিসনে ইংরেজদের দেশে ফার্ষ্ট হ'ল।

আই. সি. এস. ছাড়া

সুভাষের বিলাত পৌঁছানর পরই আমার এম. এ. পরীক্ষার ফল বার হ'ল। কম্পারেটিভ ফিললজিতে ফার্ষ্ট ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়েছিলাম। পরীক্ষায় ফল বার হওয়ার আগেই স্যার আশুতোষ আমার Essay paper দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন—৯০% মার্ক পেয়েছিলাম। পাশ করার সাত দিনের মধ্যেই স্যার আশুতোষের কৃপায় নবগঠিত ইউনিভার্সিটি পোষ্ট্‌ গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের আধুনিক বাংলা কবিতা ও ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলাম। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা ১৯২০ সালে দিলাম। বিলেতে শিক্ষালাভের জন্য স্যার আশুতোষ ইউনিভার্সিটি ষ্টেট্‌ স্কলারসিপেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হ'ল বিলেত গিয়ে কেম্ব্রিজে সুভাষের ওখানে উঠেই পড়াশুনা করবো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। সুভাষ আই. সি. এস. পাশ করে যখন আমায় লিখলো এখন সে কি করবে, তখন আমার বুকটা কেঁপে উঠলো—তবে কি শেষ পর্য্যন্ত সুভাষ ইংরেজের গোলামিতে ঢুকবে? আমাদের জীবনের স্বপ্ন সাধ সব কি ভেঙ্গে যাবে? আমি নিরুপায় ও অসহায় হ'য়ে দিনরাত ভাবতে লাগলাম—সে কিছুতেই হ'তে পারে না।

এর জন্যে আমার যা করতে হয় করবো। লখিন্দরের লোহার ঘরে কালসর্প ঢুকে তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল—কিন্তু বেহুলার প্রেম তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করলাম স্টেট স্কলারসিপ্ নিয়ে আর আমার বিলাত যাওয়া হবে না। আমি সুভাষকে লিখলাম—"আমার আর বিলাত যাওয়া হ'ল না—তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়ে আসার সঙ্কল্পকে যদি মুহূর্তের জন্য স্থান দিয়ে থাকো, তাহ'লে চাকরি গ্রহণ করাই ভাল, কোথায় posted হবে জানিয়ো আমি সেখানে অসহযোগ প্রচার ক'রে তোমার হাতে শাস্তি নিয়ে জেলে যাবো।" সুভাষ লিখলো—"আমি যাচ্ছি, গিয়ে এর জবাব তোমায় দেবো, তবে যেতে একটু দেরী হবে, কারণ জুন মাসে (১৯২১) ট্রাইপস পরীক্ষাটা দিয়ে যাবো।"

তখনকার সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ মিঃ মণ্টেগুর নিতান্ত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. রিজাইন দিল। তাঁর বাড়ীর লোকেরাও এই Heavenborn Service ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না—এমন কি তার ফিরে আসার ভাড়া পর্য্যন্ত নাকি দিতে পারবেন না বলে পাঠালেন। দেশবন্ধুর আদেশমত আমি লিখে দিলাম—ভাড়া আমরা পাঠাবো, তুমি চ'লে এসো। সুভাষের বিলাতে অনেক টাকা ধার হয়েছিল—এই টাকা ও ফিরবার জাহাজভাড়া বন্ধু বান্ধবেরাই দিলেন। সে সময়কার তার বিলাত প্রবাসী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, দিলীপ-কুমার রায় এবং ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কিরণবাবু তো ফিরে এসে অসহযোগীদের দলে ভিড়ে গেলেন। দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আগে শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন—শ্যাম বাবু তাঁকে বলেছিলেন—জামদগ্ন্য-ঋষি মন্ত্রবলে একলক্ষ সেনা তৈরি করেছিলেন এতে যদি বিশ্বাস না কর, তবে অসহযোগ করো না। ঋষি শ্যামসুন্দর বোধ হয় ঠিক কথাই বলেছিলেন!

কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেস ও নাগপুর কংগ্রেস (১৯২০)

১৯২০ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ মশায় যখন তাঁর "নারায়ণ" পত্রিকার ভার সদ্য আন্দামান প্রত্যাগত শ্রীযুত বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির উপর দেন—সেই সময়ে আমি এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশি। নারায়ণে "ভিখারী" নামে আমার একটা গল্প বাহির হয়। সেটা পড়ে খুব খুসী হ'য়ে চিত্তরঞ্জন বারীনদাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠান। সেই সূত্রে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আমার সংস্পর্শ হয়।

বারীনদার পাল্লায় প'ড়ে ১৯২০ অব্দের কলিকাতা স্পেশাল

কংগ্রেসে যোগদান করি। লালা লাজপৎ রায় সভাপতি হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জনের দলে ভিড়ে যাই।

ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। তখন কাউন্সিলের নির্ব্বাচন শেষ হয়েছে—জাতীয় নেতারা কেউ দাঁড়ান নি। মহাত্মার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের একটা আপোষ হয়ে গেল। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ভার কংগ্রেস গ্রহণ করলেন। বাংলায় ফিরে চিত্তরঞ্জন বিরাট আয়ের আইন ব্যবসা ছেড়ে অসহযোগ ব্রত নিলেন। আমরাও তাঁর ডাকে ক্ষুদ্রজীবনের সব আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালাম।

নাগপুর কংগ্রেসে গণদেবতার স্বরূপ খানিকটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। অসহযোগের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্না ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা কোথায় ভেসে গেল। মৌলানা মহম্মদ আলি ও পণ্ডিত মতিলালের বক্তৃতায় অসহযোগ সমর্থিত হ'ল।

মুক্তি ফৌজের একজন লোককে লণ্ডনের অস্থানে দেখে একজন পুলিশ বলেছিল, ২০ বৎসর মুক্তি ফৌজে আছ বলছো, কিন্তু এমন স্থানে আমার আগে তোমার মুক্তি ফৌজ ছাড়াই উচিত ছিল। দেড়শো বছরের উপর বৃটিশ শাসনে থেকে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় এসে যখন পৌছতে হয়েছে, তখন ঐ শাসনের সংশ্রব ত্যাগ করাই উচিত! মৌলানা সাহেব ঐ এক কথাতেই মাৎ করে দিলেন! মিঃ জিন্না ক্রুদ্ধ সাপের মত

গর্জ্জন করতে করতে যে বক্তৃতা দিলেন, তা কোথায় ভেসে গেল! প্রতিনিধিরা অবশ্য কি বুঝে হাত তুললেন জানি না। যাঁরা ইংরেজী জানেন না এমন প্রতিনিধি অনেক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছিলেন, "বাবুজী, শেমকা বখত আয়া?" আমরা নষ্টামী করে মধ্যে মধ্যে বলছিলাম "হাঁ, জী,—আয়া!" এর ফলে অনেক সময় পণ্ডিত মতিলালের বক্তৃতার মধ্যেও "শেম, শেম" ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো!

নাগপুর কংগ্রেসে যোগ দেবো বলে মনে কিছু ছিল না। চিত্তরঞ্জন বাংলার ডেলিগেটদের জন্য স্পেশাল ট্রেণে যাচ্ছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। শ্রীযুত নিশীথ সেন, সত্যেন মিত্তির, শচীন সান্যাল প্রভৃতি ঐ গাড়ীতে ছিলেন; গাড়ী চলতে সুরু করেছে, এমন সময় হাত ধরে টেনে ওঁরা উঠিয়ে নিলেন। আমি এক কাপড়েই বিনা সম্বলে নাগপুর চললাম। নাগপুরে একটা স্কুলঘরে আমাদের জায়গা হয়েছিল—সেখানে অধ্যাপক নৃপেন ব্যানার্জ্জি ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটানো গেল। খেতে হত ডেলিগেট ক্যাম্পে—সেখানে 'তুপ্' মহারাজকে নিয়ে কোলাহল পড়ে যেতো। ও দেশের ভাষায় ঘিকে তুপ্ বলে; তাই যিনি ঘি পরিবেশন করতেন, তাঁকে সকলে 'তুপ মহারাজ' নাম দিয়েছিল।

কংগ্রেস ক্যাম্পে ছোটখাটো একটা মারামারিও হ'য়ে গেল। শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন প্রভৃতি মহাত্মাজীর দলের

অনেকে বেশ কিল ঘুষি খেলেন। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মহাত্মার সামনে একজন অপরাধী বলে হাজির করা হল। কিন্তু সে যাত্রায় নির্দ্দোষ বলে খালাস পাওয়া গেল, যদিও আমার আবলুস কাঠের শক্ত ছড়িটা সদ্ব্যবহারে খণ্ড খণ্ড হয়ে অহিংস হয়ে গিয়েছিল।

অসহযোগের পূর্ব্বে শ্রমিক আন্দোলন

নাগপুর থেকে কলকাতায় ফিরে চিত্তরঞ্জনের কাছে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে যাতায়াত করতাম। ইতিপূর্ব্বেই রাণীগঞ্জের পেপার মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘট পরিচালনায় স্বামী বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে যোগদান করেছিলাম। মিঃ কে সি রায়চৌধুরী আমায় পাঠিয়েছিলেন। মেমসাহেবদের কি দুর্দ্দশাই দেখলাম, খানসামা—বাবুর্চিরা কাজ ছেড়েছে, উনুনের নীচে কয়লা দিয়ে মেমসাহেবেরা উপরে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন—তবুও জ্বলছে না! কলকাতা থেকে রেলে খাবার-দাবার আসছে—দুধের অভাবে ছোট বাচ্চারা কত কষ্ট পাচ্ছে। যাই হোক, আমরা খাওয়াতে একটা আপোষ হয়ে গেল।

বি, এন, রেলওয়ে শ্রমিক সংঘের সভাপতি ব্যারিষ্টার

নিশীথ সেন ও আমায় নিয়ে ধর্ম্মঘট উপলক্ষে খড়্গপুরে গিয়েছিলেন। মিঃ সেন আমায় চিরদিন স্নেহ করে এসেছেন ও আমাদের কাজের জন্য মুক্ত হস্তে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর ঋণ জীবনে শোধ হবে না।

জামসেদপুর লেবার এসোসিয়েসনের সভাপতি তখন ছিলেন মিঃ এস এন্ হালদার ব্যারিষ্টার এবং সম্পাদক বিপ্লবী শচীন সান্যাল। আমাদের মনে মনে ধারণা ছিল লোহার কারখানা একটা হাতে থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে কামান গোলাগুলি তৈরির সুবিধা হবে!

ই, বি, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এই সময় লালমণির হাটে আরম্ভ হয়। উদ্যোগী ছিলেন গার্ড যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত—পরে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে লেবার মেম্বার হয়েছিলেন। স্থাপনা সভায় মিঃ এস, এন, হালদারের সভাপতি হবার কথা ছিল, তিনি বিশেষ কারণে যেতে না পারায় আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন বর্ষায় ভীষণ দুর্য্যোগ—মাত্র জন কয়েক লোককে নিয়ে আমারই সভাপতিত্বে সভা হ'ল।

এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন নামক মার্চ্চেন্ট অফিসের কর্ম্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সভা তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, কে, সি, রায়চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। আজও নীরব কর্ম্মী মুকুন্দলাল জীবনে বহু বাধা বিপর্য্যয় এবং সুদীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগের পর দেশের কাজ করছেন।

প্রেস এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন তখন গবর্মেণ্ট প্রেস সমূহে ষ্ট্রাইক ঘোষণা করেছেন—চিত্তরঞ্জন ধর্ম্মঘটকারীদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। আড়াইমাসকাল ১০ হাজার লোকের ধর্ম্মঘট চলার পরে কিছু অধিকার ও সুবিধা অর্জ্জন করা গেল। এই সংস্রবে চিত্তরঞ্জনের কাছে আমাকে ঘন ঘন যাতায়াত করতে হত। এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন, আমি ছিলাম অন্যতম সহকারী সভাপতি।

অসহযোগ আন্দোলন

শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেও চিত্তরঞ্জন আমায় দিলেন ঢাকা ন্যাশনাল স্কুলের সংগঠনের ভার। আমি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করি। কাজে ইস্তফা দিতে চাইলাম—দেশবন্ধু বললেন ঢাকা থেকে ঘুরে এসে যা হয় করো। বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়াকে ঢাকা ন্যাশনাল স্কুলের ভার দেওয়া হ'ল। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালির একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং আজও চট্টগ্রামের কোনও কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আছেন শুনেছি।

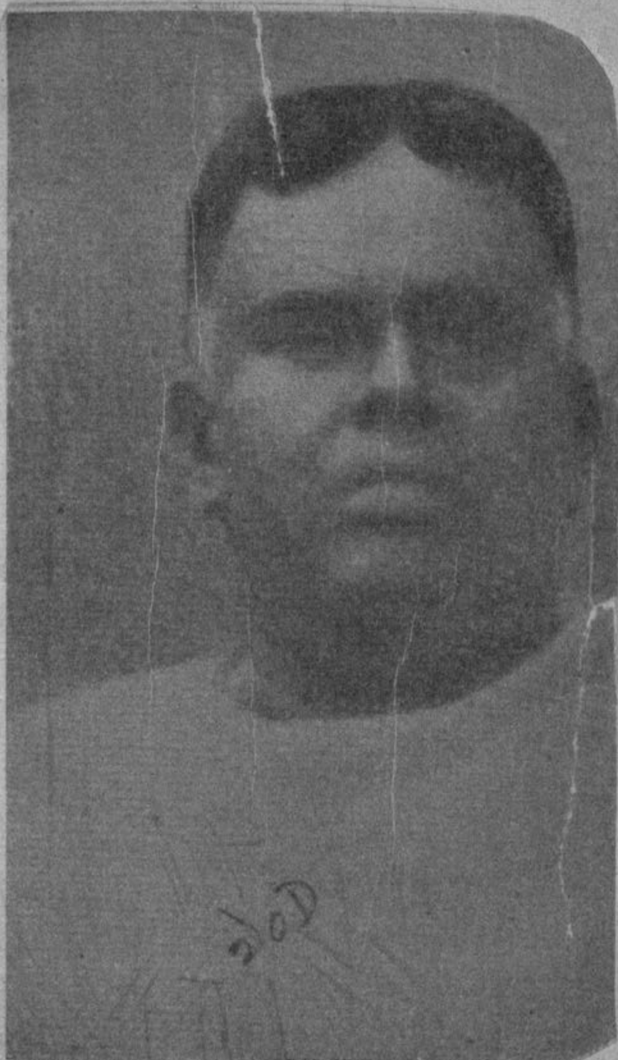
অসহযোগী ছাত্রেরা মাথায় করে কেরোসিন ফিরি করে দিন চালাতে লাগলেন। সে কি অপূর্ব্ব কষ্ট-সহনশীলতা ও উৎসাহ। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক সতীশ-

চন্দ্র সরকার মহাশয়কে অনেক কষ্টে আন্দোলনে নামানো গেল। ঢাকা ন্যাশনাল স্কুলের মেডিকেল বিভাগটিই আজ পর্য্যন্ত টিকে আছে এবং ভালই চলছে।

কলকাতায় চিত্তরঞ্জন মেডিকেল স্কুল এই সময়ে স্থাপিত হয়। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, এস, সি, সেনগুপ্ত ও কুমুদশঙ্কর রায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলে আজ জাতির শিক্ষা কেন্দ্রের একটি নতুন স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

টিকলো না শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় বিদ্যাপীঠ—"গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তন"। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রকাণ্ড বাড়ীতে মহাত্মা গান্ধী এর উদ্বোধন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বিলেত থেকে আই. সি. এস. ছেড়ে এসে এই বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবেন স্থির হ'ল।

১৯২১ অব্দের জানুয়ারী মাসে দেশবন্ধু যখন বাংলার ছাত্রদিগকে ডাক দিলেন, তখন কম পক্ষে ৫০ হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ছাড়লো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ হ'ল। আর কয়টা দিন পরে হ'লে প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ বৃত্তিটা পাওয়া যেত ও ষ্টেট স্কলারশিপ্ নিয়ে বিলাত যাওয়া হত। সুভাষচন্দ্রের ওখানেই কেম্ব্রিজে গিয়ে উঠতাম। কিন্তু সবুর সইল না—ভাবলাম দেশ উদ্ধার পালিয়ে যাবে। সুভাষ লিখল জুন মাসে ট্রাইপস পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরবে। শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষও পি. এইচ. ডি. উপাধিটা নিয়ে দিন কতক দেরী করে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন।



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল

আর আমি চিরকালই ছিলাম একটি আস্ত গর্দ্দভ—ও সব ছাপের কি প্রয়োজন উপলব্ধি হ'ল না—তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়লাম নেতার একটি কথায়। সুভাষকে লিখলাম, "তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এ'স, আমার এ যাত্রায় বিলাত যাওয়া হ'ল না, অসহযোগীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তোমার আদালতে বিচার হয়ে জেলে যাওয়াই বোধহয় আমার ভাগ্যে আছে।"

সুভাষ লিখলেন—"আমি ফিরে গিয়ে তোমার প্রস্তাবের জবাব দিচ্ছি।". আমার একটি কথাতেই সে আই. সি. এস. ছেড়ে এসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল।

বিলাত হতে প্রত্যাগমন

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা শুনে পাগল হয়ে আই. সি. এস. ছেড়ে ছুটে দেশে ফিরলো—এটা ভুল কথা। সে ঠাণ্ডা মাথাতেই বহু পূর্ব্বে থেকে এরূপ সংকল্প কোরে বিলেত গিয়েছিলো, তা আগেই বলেছি। বিলেত থেকে বোম্বাইয়ে নেমে সুভাষ শুনলো মহাত্মা গান্ধী সেখানেই আছেন। সুভাষের Indian Struggle নামক গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, সে গান্ধীজীকে কয়েকটা প্রশ্ন করে এবং তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। অহিংস অসহযোগ করে

transference of power কি করে হতে পারে জিজ্ঞাসা করাতে মহাত্মাজী বলেছিলেন—by change of heart. সুভাষ তা মেনে নিতে পারেনি।

যাই হোক ১৯২১ সালে জুলাই মাসে সে বোম্বাই থেকে কলকাতা এসে আমার কাছে এলো। তখন আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে থেকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করি। সুভাষকে নিয়ে দেশবন্ধু, বাসন্তী দেবী ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। সকলেই তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

ঠিক হল, সুভাষ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গৌড়ীয় সর্ব্ব-বিদ্যায়তনের ভার নেবে এবং পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একখানা ইংরেজী দৈনিক (Forward) বের করলে সেটার ভার নেবে। তখন "বাংলার কথা" সাপ্তাহিক ভাবে বেরুচ্ছে—আমার ওপর কাগজখানার ভার ছিল।

ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে সুভাষ কি পরিশ্রমই না করতো! দেওয়ালে ম্যাপ ও ছবি টাঙানোর জন্যে পেরেক মারা, ব্ল্যাক বোর্ড মোছা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কাজ নিজে করতো। আমিও ন্যাশনাল কলেজের বাংলার অধ্যাপকতা করতাম। কিরণবাবু ও আমার হাসি বিদ্রুপ সহ্য করেও সে আপনমনে নিজের কাজ করে যেতো। এই সময়ে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ও ন্যাশনাল কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন।

কয়েক মাস ন্যাশনাল কলেজে কাজ করার পর সুভাষ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রচার বিভাগেরও ভা
নিল। বাংলার রাজনীতিক গগনে তখন ঘনঘটার সঞ্চার হয়ে
এসেছে। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তখন বি. পি. সি.
সি.র সম্পাদক। তাঁর "স্রোতের তৃণ" নামক আত্মকথা
থেকে এই সময়ের কথা উদ্ধৃত করলাম।

অসহযোগের ভলেণ্টিয়ার আন্দোলন ও হরতাল

"১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে যুবরাজের বোম্বাই বন্দ
পদার্পণ ক'রার বন্দোবস্ত ছিল ব'লে, তার কয়েকদিন পূর্ব্বে আ
সংবাদপত্রে বাংলাদেশের সমূহ জেলা এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি
সেই তারিখে হরতাল ক'রবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম; এবং যত
স্মরণ হয়, সে সময় প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটিকেও এ সম্ব
একখানি পত্র লিখেছিলাম। হরতালের দিনে কা'কে কি ক'র
হ'বে, সে সম্বন্ধে যে কয়েক সহস্র ছাপান নোটীশ বাংলার নানাস্থ
বিতরিত হয়েছিল, তাতেও আমার সম্মতিমতে আমার নাম ছিল
এমন কি, তার পাণ্ডুলিপি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ আকার ধারণ ক
তাও আমি জানতাম না। আমি শুনেছি এই নোটীশের
পল্লীগ্রামে হরতালের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল,
সেইজন্য আমার স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করা আবশ্যক হয়েছে যে,
নামের ভাগী আমাদের কংগ্রেসের 'পাব্লিসিটি বোর্ড' বা প্র
বিভাগ এবং তার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ম

৭ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় কিরূপ হরতাল হ'য়েছিল তা কারও অবিদিত নেই, কিন্তু একথা সত্য যে কলিকাতার সেই হরতালের সুবন্দোবস্তের জন্য আমার একেবারেই হাত ছিল না, ব'লে হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও কলিকাতা খেলাফতের কর্তৃপক্ষগণ সেজন্য প্রাণপণ ক'রে পরিশ্রম ক'রেছিলেন।"

১৯২১ সনের ২৭শে নভেম্বর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক ...কে ভলেন্টিয়ার' আন্দোলন বিরোধী গভর্ণমেন্টের ইস্তাহার অমা... স্থির হ'ল। এই সময়কার বিস্তৃত বিবরণ আমার লিখিত "বন্দীর ...রী" নামক পুস্তক হ'তে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"ভলান্টিয়ার সমিতির কাজ চালানো সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রস্তাবক সমর্থক হইলেন ঢাকার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্ল ... ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও বর্ত্তমান লেখক। নেতা... ...লে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সরকারী ভাড়া-করা গুণ্ডা ...রা মারামারির সম্ভাবনা থাকায় কলিকাতায় আপাততঃ ...সমিতি বন্ধ রাখিয়া পরে সুবিধামত করা হইবে স্থির হইল। ...শিক কংগ্রেস কমিটি দেশবন্ধুর হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিয়া দিলেন। ...র প্রস্তাবের পর কে কে কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন, তাহা ঠিক ... ভার তাঁহাকে দেওয়া হইল।

...ঠা ডিসেম্বর ৫জন স্বেচ্ছাসেবককে খদ্দর ফেরি করিতে বাহির ... হইল। তাহাদের কেহ ধরা পড়িল না। ৫ তারিখে কয়েকজন ... পড়িল। দেশবন্ধুর ভয় হইয়াছিল এক হাজারের বেশী লোক ...ন যাইবার জন্য পাওয়া যাইবে না—তাই ঠিক হইল ৫।১০।২০ ... করিয়া ক্রমশঃ অল্পে অল্পে সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।' আ... ...রা বিনা ব্যাজেই (badge) বাহির হইবে—কারণ গভর্ণমেন্টের

লোক খ্যাজ লইয়া হরতাল বন্ধ করিবার জন্ত ঘুরিতেছে শুনা গেল।

চিররঞ্জনের কারাবরণ

'৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে হয় স্বরাজ, না হয় কারাবাস, (গণ ইহাই ঠিক করিয়া দিলেন। সময় আর বেশী নাই, স্ব সমর ঘোষিত হইয়াছে—কিন্তু সেনা কই? বাঙালী যুবকেরা ও সুবোধ বালকের মত গভমের্ণ্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় কে দেশের জন্ত লড়িবে? অশিক্ষিত কুলী মজুর সব দলে দলে ক লাগিল, হিন্দুস্থানী ও মুসলমান আসিল, কিন্তু বাঙালীর ছেলে কোথ

"এই দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া দেশবন্ধু ঠিক করিলেন ে ডিসেম্বর তারিখে একজন এমন লোককে পাঠাইতে হইবে যে ে হইলে দেশের লোকের দৃষ্টি একটু পড়ে। ১১নং ওয়েলিংটন ে কংগ্রেস অফিসের নীচের তলায় একটি ছোট ঘরে দেশবন্ধুর পর গৃহ ছিল। বিকালে তিনি আসিয়াছেন—আর সে ঘরে শ্রী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, চিররঞ্জন দা বর্ত্তমান লেখক ছিলেন। কে বাহির হইবে? একে একে বর্ত্ত লেখক, সুভাষচন্দ্র, চিররঞ্জন ও কিরণবাবু যাইবার জন্ত আগ্রহ প্র করিলেন। "বাংলার কথা" চালানোর ও লেখাপড়ার কাজের আমার আবেদন না-মঞ্জুর হইল। সুভাষচন্দ্রকে ভলেন্টিয়ার কাপ্তেন হইয়া রোজ রোজ তাহাদিগকে বাহির করিবার ভার স হইল, তাহারও যাওয়া হইল না। শ্রীযুক্ত কিরণবাবু সর্

বিভাগ চালাইবেন বলিয়া তাঁহাকেও থাকিতে হইল। শ্রীমান বলিলেন, আমার তো কাজ নাই, আমি বাহির হই। দেশবন্ধু সহিত তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। ঠিক হইল ৬ই ডিসেম্বর ণ্টিয়ার লইয়া চিররঞ্জন বাহির হইবে।

সম্বর সকালে দেশবন্ধুর বাড়ীতে যে দৃশ্য ঘটিয়াছিল তাহার একটু ক। পূর্ব্বদিন রাত্রি ১১টার সময় দেশবন্ধু দক্ষিণ কলিকাতা মিটির প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুত হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয়কে বলিয়া দিলেন যেন পরদিন সকালে ২৫ জন ভলন্টিয়ার র সঙ্গে যাইবার জন্য ঠিক থাকে। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই খোঁজ করিতেছিলেন ২৫ জন ঠিক হইয়াছে কিনা। ক্যাপ্টেন ন্দ্র তো চিররঞ্জনকে পাঠাইতে নারাজ, নিজেই আগে যাইতে বর্ত্তমান লেখকের যাইবার আবেদন পুনরায় অগ্রাহ্য হইল। যে ৬ই দ্বিপ্রহরে কংগ্রেস অফিস হইতে শ্রীমান চিররঞ্জন খদ্দর ফেরি করিবার জন্য কলেজ ষ্ট্রীট-হ্যারিসন রোডে অন্যান্য ভলান্টিয়ার সহিত বাহির হইলেন।

প্রত্যেক ৫জন সেবকের সঙ্গে একজন চর থাকিত। কোথায় য় যাইতে হইবে চালক নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইত। আর কোথায় যাইল, কিম্বা ধরা পড়িল, সে খবর তৎক্ষণাৎ অফিসে হাইয়া দেওয়া চরের কাজ ছিল। সে তফাতে তফাতেই থাকিত। ল বেলায় খবর পাওয়া গেল চির গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহার আরও ১৮জন ধরা পড়িয়াছে।

"তখন কংগ্রেস অফিসের চৌতলায় আমাদের বৈঠক বসিয়াছিল। ড়ায় গুলি চালানোর পর কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার [illegible] ভাষাতে চমৎকার দিলেন—এমন সময় দুঃসংবাদ [illegible]! শরৎবাবু

প্রমাণ করিয়া দিলেন জেলটা তেমন ভাল জায়গা নয় এবং তাঁহার ন পছন্দ হয় না। করণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কাল সবাই যেতে চাইলো দেখে আমিও ভয়ে ভয়ে যেতে চেয়েছিলাম। গেলেই রা পড়েছিলাম আর কি! এইরূপ মজার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কলেই কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছিলেন—দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

"নীচে দেশবন্ধু পুত্রের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া অটল কর্ত্তব্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে বসিয়া কার্য্যের নির্দ্দেশ দিতেছিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি উদ্বেলিত অন্তঃকরণে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অটল নিস্তব্ধতার মাঝে সান্ত্বনার কাঁদাকাটি বা প্রবোধ-দানের অ র হয় নাই। যিনি জীবনের সর্ব্বস্ব দান করিয়া একমাত্র পুত্রকেও দে র জন্য সানন্দে কারাগারে প্রেরণ করিলেন—তাঁহার সান্ত্বনার উৎস ভগবানের কাছে, এখানে নয়।

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আসিয়া সমবেদনা কাশ করিয়া গেলেন। সমস্ত বাড়ীটা যেন মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। লালবাজারের হাজতে শ্রীমানের জন্য কম্বল ও খাবার পাঠানো হইবে ন তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। দেশবন্ধু একা নের জন্য না পাঠাইয়া সকলের জন্যই খাবার ও কম্বল কিনিতে ন। কিন্তু হাজতে গিয়া শোনা গেল, দেরী হইয়া গিয়াছে, খাবার দেওয়া চলিবে না এবং শ্রীমানেরা তাহার পূর্ব্বেই দের হাতে নিঃশব্দে অনেক চড়, লাথি ও গালাগালি

কুম হইয়া গেল—মোটা চালের ভাত ও এক তরকারী খাইবেন। দুঃখের চিহ্ন কোথাও নাই—একটা নিস্তব্ধ এ গম্ভীরতা ঝড়ের সূচনা করিতেছিল।

৫ তারিখে প্রেসিডেন্সী জেলে দেশবন্ধুর সহিত আমরা জিতেন্দ্রলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল হ্যামিলটনের আদেশ অনুসারে সকলকে চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল এবং জেলর সাহেব আমাদের কাছে অনুগত ভৃত্যের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি শুধু মনে মনে ভাবিতেছিলাম—কাল বোধহয় আমাদিগকে জেলর সাহেবের নিকট দাঁড়াইতে হইবে, আর তিনি চেয়ারে বসিয়া আমাদিগকে হুকুম করিবেন। আসিবার সময় জিতেনবাবুর পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম—"বাহিরে অনেক ঝগড়া আপনার সঙ্গে করিয়াছি, এখন বুঝিয়াছি কিছু অন্যায়ও হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন, এখন ঝগড়া ক'রতে হয় তো জেলে আসিয়া করিব। জিতেনবাবু হাসিতে হাসিতে স্নেহ-আলিঙ্গন দিলেন।

"চিররঞ্জন ওরফে ভোম্বল পরদিন প্রেসিডেন্সি জেলে দেখা করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি একেবারে ভিতরে গিয়া দেখা করিব এবং ভোম্বলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব বলিলাম। বিধাতা সে সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করেন নাই।

দেশবন্ধু ও গবর্ণরের সাক্ষাৎকার

"ঐ-দিন সন্ধ্যার সময় গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে ে করিয়া চিঠি আসিয়াছে।

"২৪ শে ডিসেম্বর যাহাতে হরতাল না হয়, তাহার একবার দেশবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার বন্দোবস্ত করিতে ছিলেন। কিন্তু ডাকিয়া পাঠাইলে যে মান যায়, তাই নানা কে

চেষ্টা করা হইল যাহাতে দেশবন্ধু নিজে হইতে যান। প্রথমে মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর দূতী হইয়া আসিয়া অনুরোধ করিলেন। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী গুর্লে সাহেব টেলিফোনে কত হাসিখুসীর সঙ্গে বলিলেন যে মিঃ দাস His Excellencyর (লাটসাহেবের) সঙ্গে দেখা করিতে চান শুনিয়া তিনি বড় আনন্দিত হইয়াছেন। ঘন ঘন টেলিফোন ও চিঠি আসিতে লাগিল। এদিকে দেশবন্ধুও লিখিত নিমন্ত্রণ না পাঠাইলে যাইবেন না। সাহেব বলিলেন যে লাটবাহাদুর কি বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইবেন! দাশ মশায়ও উত্তর দিলেন তাঁহার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি আহূত না হইয়া কোন্ সাহসে মহামান্য গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন! এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেলে অবশেষে সরকার পক্ষ হইতেই ডাকা হইল। গভর্ণর স্বীকার করিলেন হরতাল করিতে অনুরোধ করা বে-আইনী নয়, খদ্দর বেচা বে-আইনী নয়, তবে আমাদের দেশের লোকেই তাঁহার নিকট নালিশ করিয়াছে যে স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহাদের উপর জুলুম করে—তাই তিনি ইস্তাহার জাহির করিয়াছেন। যাই হউক—দেখা হওয়ার ফলে কিছুই হইল না।

বাসন্তীদেবীর কারাবরণ

"৭ই ডিসেম্বর (১৯২১) বাংলার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন।

"১৪৮ নম্বর রসারোডে শ্রীযুক্ত দেশবন্ধুর ভবনে সেদিন সকলেই উঠিয়াছেন—রাত্রে বোধ হয় কাহারও ঘুমই হয় নাই। দেশবন্ধু চায়ের টেবিলে বসিয়া 'সার্ভেন্ট' কাগজখানা পড়িতেছিলেন। সম্পাদকীয়

শুক্তে তাঁহার অতুলনীয় ত্যাগ এবং চিররঞ্জনের গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সেটি পড়িতে পড়িতে দেশবন্ধুর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি বলিলেন 'আমার ছেলের জন্য আমি দুঃখিত নই, আমার একটি ছেলে আমি দিয়েছি, কিন্তু বাংলা দেশে কি আর ছেলে নাই, বাংলার সোনার ছেলেরা কি মরে গেছে?'

"বাংলার যুবকগণের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য দেশবন্ধু ইতিপূর্বে একটি আবেদন বাহির করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে ফল কিছুই হয় নাই। তাই তিনি ঠিক করিলেন দেশে যদি পুরুষ নাই থাকে, তবে ঘরের মেয়েদের স্বেচ্ছাসেবক হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে হইবে। ক্যাপ্টেন বসু ও আমরা অনেক আপত্তি করিলাম। পুরুষ সকলে কারাগারে গেলে তারপর মেয়েদের নামা উচিত—অন্ততঃ আমরা থাকিতে তাঁহারা বাহির হইবেন—ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। জলদগম্ভীর স্বরে "Crying Captain" (সুভাষচন্দ্র) ও আমাদের উপর হুকুম হইল—'তোমরা কাজ চাও না ভাবের আবেগের বিলাসিতা চাও?' অতঃপর স্থির হইল শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ভলান্টিয়ার লইয়া বাহির হইবেন। দেশবন্ধুর ভগিনী শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের শ্রীমতী উমা দেবী ও সুনীতি দেবী আসিলেন। তিনজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ বাহির হইবেন স্থির হইল। চালক হইয়া কে যাইবে কথা উঠিলে আমিই অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দেশবন্ধু অমত করিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর এই সর্ত্তে অনুমতি দিলেন যে আমি গাড়ীতে থাকিয়া উহাদের নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইব এবং ইচ্ছা করিয়া ধরা দিব না। আমি তাহাতে রাজী হইলাম। সুভাষচন্দ্রের বাড়ী হইতে মোটর আসিল। সেই গাড়ীতে আমরা চড়িয়া কংগ্রেস আপিস হইতে খদ্দর ও দুইজন ভলান্টিয়ার লইয়া প্রথমে কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিলাম। এইখানেই

আগের দিন চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হন। মায়েরা চারিদিকের দোকানে হরতাল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলেই স্বীকৃত হইলেন। মায়ের হাতের খদ্দর কত লোকে কিনিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া উঠিল। আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিনী ও ভগিনী দেশের জন্য রাস্তায় বাহির হইয়াছেন দেখিয়া কত লোক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

"নিকটে যে সমস্ত কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা কিছু বলিল না। পূর্ব্বদিন চিররঞ্জনকে জোড়াসাঁকো থানায় লইয়া যাওয়া হয়। আমরা তারপর জোড়াসাঁকো থানার দিকে চলিলাম। সুভাষের গাড়ীখানা খারাপ হইয়া গেল। একখানা ট্যাক্সি লইয়া রওনা হইলাম। ট্যাক্সি-ওয়ালা ভুল করিয়া জোড়াবাগান আউট্‌পোষ্টে লইয়া গেল। সেখানে রাস্তায় দণ্ডায়মান একজন পুলিশ প্রহরীকে গ্রেপ্তারের কথা বলিতে সে বলিল—'আমরা চাকরী করি বলেই কি এমন অধঃপতিত হয়েছি যে মায়েদের গ্রেপ্তার করবো?'

"জোড়াবাগান থেকে একজন হিন্দুস্থানী যুবক একখানা মোটরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। জোড়াসাঁকো থানার সামনে যে সমস্ত দোকান আছে তাহাদিগকে হরতাল করিতে বলা হইল এবং মায়েরা ইন্‌সপেক্টর বাবুর কাছে খদ্দর বিক্রয়ের জন্য গেলেন। তখন হাজার হাজার লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"বড়বাজার থানার সম্মুখ দিয়া যাইয়া ফিরিবার সময় দেখিলাম একখানা মোটর বাইকে পুলিসের এ্যাসিষ্টেণ্ট কমিশনার ও দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিতেছে। মাকে এই কথা বলাতে তাঁহারা আবার ফিরিয়া থানার দিকে চলিলেন। দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিয়া মায়েদের জিজ্ঞাসা করিল, 'Madam, what are you doing here? (মহাশয়া, আপনারা এখানে কি করিতেছেন?)' মায়েরা বলিলেন 'We are selling

khaddar and declaring haratal (আমরা খদ্দর বিক্রয় করিতেছি ও সকলকে হরতাল করিতে অনুরোধ করিতেছি)' সার্জ্জেণ্ট—'Will you kindly walk to the Thana? (আপনারা অনুগ্রহ করিয়া থানায় যাইবেন?)' মায়েরা—'Oh, yes, most gladly (নিশ্চয়ই আনন্দের সহিত যাইব।)' আমি তখন গাড়ী হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'মা আপনাদের কি গ্রেপ্তার করিয়াছে?' 'মা বলিলেন—'হ্যাঁ।' তখন বেলা সাড়ে চারটা হইবে।

"তখনি ট্যাক্সি লইয়া কংগ্রেস আপিসে চলিলাম। আর একটি ছেলেকে দিয়া বাড়ীতে টেলিফোন করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিলাম। কংগ্রেস আপিসে খবর পৌছিতেই কলিকাতা বিদ্যাপীঠ অধ্যাপকদের নিষেধ সত্ত্বেও ভাঙ্গিয়া গেল এবং ছেলেরা দলে দলে গ্রেপ্তার হইবার জন্য বাহির হইল। সকলের মুখেই দৃঢ়ভাব, কথা নাই। আমি তো ৫ জন খিলাফতী ভলাণ্টিয়ার লইয়া বড়বাজারের দিকে ট্যাক্সিতে চলিলাম। থানার সম্মুখে যাইতেই রিভলভার হাতে একজন সার্জ্জেণ্ট আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। চারিদিকে লাল পাগড়ীর ভিড়—রাস্তায় কাতারে কাতারে সংক্ষুব্ধ জনসংঘ। কত লোক গ্রেপ্তার হইবার জন্য স্বেচ্ছায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! পুলিসের লোকের চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

"থানার ভিতর গিয়া মায়ের কাছে আসিয়া প্রাণটা বাঁচিল। বড়বাজার থানার পাঞ্জাবী ইনস্পেক্টর ম'শায় বড় ভদ্রলোক—অশ্রু সিক্ত নয়নে তিনি আমাদের যথাসম্ভব আদর যত্ন করিলেন। হাওড়ায় যখন গুর্খা পুলিশ মোটর ভরতি হইয়া রাতদুপুরে রাস্তায় রাস্তায় হুড়মুড় শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেমন বলেন যে জাগিয়া উঠিয়া নিজের গা টিপিয়া দেখিতেন—

'আছি মা ধরে নিয়ে গেছে।' আমারও সেই অবস্থা হইল—'ধরেছে না নেমন্তন্ন করে এনেছে' ঠিক বুঝলাম না।

"এ দিকে দলে দলে লোক আসিয়া থানা ভরতি করিতে লাগিল। ১০।১২ বছরের ছোট ছোট ছেলেরাও খাদি টুপি ও জামা গায়ে দিয়া আসিয়া উপস্থিত। দারোগাবাবু তাদের গ্রেপ্তার করিতেছেন না বলিয়া বেচারারা কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরে দেখি ঐ সব ছেলেরা কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ লাগাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বলিতেছে আমাদের বয়স ১৮ বৎসর, আমাদের ধর। একজন ধনী মাড়োয়ারী যুবককে ছাড়াইয়া লইবার জন্য তাহার পিতা কত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বেচারী আসিয়া চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল—কিছুতেই যাইতে চায় না। তাহার স্ত্রীর ও মায়ের অসুখ ইত্যাদি দুঃসংবাদ দিয়াও পিতা তাহাকে রাজী করিতে পারিলেন না। পরে যুবকটিকে হাজতে দেখি নাই, বোধ হয় চাকুতির জোরে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"ডেপুটি কমিশনার পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ি ও আর একজন এসিস্‌ট্যান্ট কমিশনার মায়েদের কত অনুরোধ করিলেন একটা নাম অনুগ্রহ করিয়া সই করিয়া দিয়া তাঁহারা যেন বাড়ী যান। মায়েরা বলিলেন—'আমরা কোন অন্যায় করি নাই, পুলিশ আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে—আমরা কোন জামিন দিতে চাই না, তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার।' লাহিড়ি ম'শায় আমার দিকে আঙুল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'Who is that boy? (ঐ বালকটি কে?)' পরে আমার পরিচয় পাইয়া আমাকেও নাম সই করিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁহার অনুরোধ আমরা রাখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত ছিলাম।

"ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কয়েকজন থানায় খাবার

প্রভৃতি আনিয়াছিলেন। বাহিরে নেতারা সংক্ষুব্ধ জনসাধারণকে ঠাণ্ডা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় কাগজে একটা কিছু message (বাণী) দেওয়ার জন্য বলিলেন—মায়েরা একটা লিখিয়া দিলেন। আমাকেও বলিবামাত্র ভাবিলাম সুযোগ ছাড়ি কেন! সব নেতাই লম্বা লম্বা message দেন—আমি না হয় ছোট্ট একটা কিছু লিখি। মাষ্টার মশায়ের মত ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া তিন লাইন লিখিয়া দিলাম—'Come out and enlist in thousands as Volunteers. Swaraj is within sight. I wish your life may be hallowed by taking part in this righteous fight for your great motherland's freedom.' ছাত্রবৃন্দ, তোমরা কলেজ ছাড়িয়া এস এবং হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হও। স্বরাজের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা মাতৃভূমির স্বাধীনতা আনয়নের জন্য এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ দিয়া তোমাদের জীবন পবিত্র হয়।

লালবাজার পুলিশ হাজতে

"মায়েদের রাত আটটার সময় ট্যাক্সি করিয়া লইয়া গেল। আমরা ৬০।৭০ জন prisoners' van-এ (বন্দী গাড়ীতে) লালবাজার রওনা হইলাম—খুব স্ফূর্ত্তি! রাস্তায় গাড়ী থামাইয়া দুই চারিজন ঢুকিয়া পড়িল। শীতকালের রাত্রে ৭২ জনের শোয়ার জন্য খানদশেক কম্বল দিল। পর্দ্দাহীন পাইখানার গন্ধে আমোদিত ঘরে নৃত্যগীতে রাতটা

কাটিয়া গেল। ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান শিখ সকলেই দলে ছিলেন। রাতে মুড়ি চিনি খাইতে দিয়াছিল। হাজতের ডাক্তার, রাইটার জমাদার প্রভৃতি সকলেই খুব ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রহরীদের মধ্যে ২।১ জন তো গানের সঙ্গে তাল দিয়া নাচিতেছিল। গান শুনিয়া সার্জ্জেণ্ট সাহেবদের ঘুম ভাঙাতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া গালাগালি দিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলে হাসিয়াই অস্থির। পূর্ব্বরাত্রে ভোম্বলদের উপরে লাথি, ঘুঁসি চলিয়াছিল—আমাদের বেলায় শুধু কথার উপর দিয়াই গেল। কপালের জোর থাকিলে এমনই হয়!

"রাত্রি শেষ হইবার আগেই অন্ধকারকে আশ্রয় লইয়া সকলে পর্দ্দাহীন পাইখানার কাজ শেষ করিয়া লইয়াছিল। মুখ ধুইবার জন্য প্রহরী ঘটি করিয়া দরজার বাহির হইতে জল ঢালিয়া দিল, আমরা হাতে আঁজলা করিয়া গ্রহণ করিলাম। তারপর ছেলেদের আর এক কাজ জুটিল। দেওয়ালে রং নতুন করা হইয়াছিল—সেই কাঁচা রং আঙুলে লাগাইয়া সাদা জায়গায় নানান রকম লেখা হইতে লাগিল। 'স্বরাজ আশ্রম—লালবাজার', '২৪শে হরতাল' ইত্যাদি কত কি যে বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, গুরুমুখী ভাষায় লেখা হইল তার আর সংখ্যা নাই। পূর্ব্বদিন রাত্রে নামধাম লিখিবার সময় যাহার যাহা পকেটে ছিল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। সকালে একখানা অমৃত বাজার পত্রিকা কি প্রকারে আসিয়া পড়িল। দেখিলাম পণ্ডিত মতিলাল ধৃত হইয়াছেন। পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে রহিয়াছে—We learn Srimati Basanti Devi (Mrs. C R. Dass), Urmila Devi, Suniti Devi and Sj Hemanta Kumar Sarkar were arrested yesterday. '(শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ঊর্ম্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী এবং শ্রীযুত

হেমন্ত কুমার সরকার কাল গ্রেপ্তার হইয়াছেন।)' সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই কয়টা কথা দিয়াই শেষ, বাকি কলমটা সব ফাঁক, সাদা জায়গা। পত্রিকার মন্তব্য পর্য্যন্ত নাই। আর এক পৃষ্ঠায় খুব বড় বড় অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে কালকার ঘটনা এবং মেয়েদের গ্রেপ্তারের কথা।

"সকালবেলার খাবার গরম গরম জিলিপি দিল—মহা আনন্দে নিজেরা ভাগ করিয়া খাওয়া গেল। শোনা গেল ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন—শীঘ্রই আমাদিগকে যাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি খাইয়া লইবার হুকুম হইল এবং এরূপ অসময়ে কেন আমাদিগকে খাবার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জমাদারকে এক সাহেব আসিয়া মধুর ভাষায় গালাগালি দিয়া গেলেন।

"বেলা আটটার সময় খিড়কি দরজা দিয়া আমাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। দুধারে লগুড়ধারী সিপাই, মধ্যে মধ্যে পিস্তল হাতে সার্জ্জেণ্টরা দাঁড়াইয়া আছে। কেহ জামিন্ দিতে স্বীকার হইল না। আসিবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম কি ভাবে চলিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন পরদিন প্রাতে প্রেসিডেন্সী জেলে বিচার হইবে। ফিরাইয়া আবার ঘরে বন্ধ করা হইল। বেলা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—প্রেসিডেন্সী জেলে কখন যে লইয়া যাইবে স্থির নাই। সময় কাটাইবার জন্ত আবার হৈ চৈ রৈ রৈ আরম্ভ হইল। লালবাজারের মেথর প্রভৃতিকে ২৪শে ডিসেম্বর হরতাল করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। অবশেষে বেলা দুইটার সময় 'লরি' (Lorry) আসিল—খাঁচার মত তার দিয়ে ঘেরা। আমরা রাস্তার দুধারের লোককে "২৪শে হরতাল" বলিতে বলিতে প্রেসিডেন্সী জেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জেলের ভিতর সারি সারি দুজন করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল—আমিও বসিলাম। খানিক পরে জেলর আসিয়া আমায় ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—'Hello, you are

here! Do you want to stay with young Das? (ওঃ আপনিও এখানে! আপনি চিররঞ্জনের সঙ্গে থাকিতে চান?)" আমি বলিলাম, 'I have no objection. If you allow I will certainly prefer it. (আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, তবে আপনি যদি থাকিতে দেন আমার ভালই হইবে।)' আমাকে আলাদা করিয়া শ্রীমান ভোম্বলের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। অন্যান্য সকলকে আর একদিকে লইয়া গেল।

"বেলা তিনটার সময় স্নানাদি করিয়া আহারে বসিলাম—আমাদের সহিত দেখা করিতে বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে। আহার রাখিয়া দেখা করিতে চলিলাম। মায়েদের রাত্রে প্রেসিডেন্সী জেলে আনিয়া female wardএ (মেয়েদের জেলে) রাখিয়াছিল। লাটসাহেব কাউন্সিল ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া রাত্রেই তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শুনিলাম পরদিন আবার তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে বাহির হইবেন। তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর কলেজের অনেক ছেলে বাহির হইয়াছে এবং শিখ-মহিলা অনেকে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ গ্রহণ করিয়াছেন।

"একবস্ত্র ও একখানা গায়ের কাপড় লইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম, বাড়ী হইতে কিছু কাপড় চোপর পাঠাইতে বলিয়া দিলাম। Interview (দেখা) করার সময় আমরা ভিতরে চেয়ারে বসিলাম, মাঝখানে লোহার জালের বেড়া—এইভাবে কথাবার্ত্তা সারিয়া cellএ (কুটুরীতে) ফিরিলাম। আহারাদি শেষ হওয়ার পর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বন্ধ করিয়া Warder (জেলকর্ম্মচারী) চলিয়া গেল।

"একহাত চওড়া একখানি লোহার খাটে বিচালির গদির উপর কম্বল বিছাইয়া মাথায় একখানা কম্বল বালিশ করিয়া আর একখানা গায়ে দিয়া মশার কামড় উপভোগ করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম। যতক্ষণ ঘুম না আসিল ততক্ষণ চীৎকার করিয়া

আমি ও ভোম্বল পাশাপাশি cell (কুটুরী) হইতে গল্প চালাইতে লাগিলাম। আমি যে কুটুরীতে ছিলাম সেটাতে নাকি কোনওকালে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জেলে আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছিলেন। আমি আসার ঠিক আগেই শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এইখানে ছিলেন।

"গভমে´ণ্ট হইতে আদেশ আসিয়াছিল যে আমাদের বিচার জেলের মধ্যেই হইবে—কেন না দুএকজন "প্রভাবসম্পন্ন নেতা" (influential leaders) নাকি আমাদের মধ্যে ছিল, যাহাদের বিচার প্রকাশ্য আদালতে করিলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইতে পারে। আমি ও ভোম্বল এই সংবাদে খুবই flattered (আপ্যায়িত) হইলাম, কারণ আমারাই নিরস্ত-পাদপ দেশের এরণ্ডক্রম ছিলাম! প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভমে´ণ্ট আমাদের ভয় করে ভাবিয়া যে কোনও শাস্তি লইতে প্রস্তুত হইলাম। ভোম্বলদের বিচার কোর্টে হইবার কথা ছিল। জেলের মধ্যে আমাদের একটু আগেই উহাদের দণ্ড হইয়া গেল। দুই বৎসর একবৎসর, ছয়মাস ও ফাইন—বিচারকের যেমন খুসী একই অপরাধে বিভিন্ন শাস্তি দিয়া চলিয়া গেলেন। ভোম্বলের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানা, না দিলে আর ছয় সপ্তাহের জেল আদেশ হইল।

"আমাদের ডাক পড়িল। কোর্ট ইনস্‌পেকটর বাবু আমাকে খাতির করিয়া চেয়ারে বসিতে দিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এস. এন. হালদার মহাশয় নোট্‌ লইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দেন নাই—কিন্তু বিচার প্রকাশ্যভাবে হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করার পরে অনুমতি দিয়াছিলেন। শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি কংগ্রেসের দুএকজনও উপস্থিত ছিলেন। সার্জ্জেণ্টরা বাইবেল ছুঁইয়া পরিষ্কার মিথ্যা সাক্ষী দিয়া গেল। একজন স্বেচ্ছা-

সেবককে দুইজন সার্জেণ্ট ধরিয়াছে বলিয়া সনাক্ত করিয়া গেল। আমার বোধ হয় দুইজনে দুইদিক হইতে দুই হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল। একে একে ভলাণ্টিয়ারগণকে জিজ্ঞাসা করাতে নানাজনে নানারকম উত্তর দিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল—'I don't like to be tried by a slave like you (তোমার মত গোলামের কাছে আমার বিচার চাই না)।' আর একজন বলিল—'I refuse to answer the servant of a Satanic Goverment (তোমার মত সয়তানী গভর্মেণ্টের চাকরের কথার জবাব আমি দিব না।)' আর একজন বলিল—'If you ask me whether I am a volunteer I will say I am what you choose to call a Gandhi Goonda (যদি আমায় জিজ্ঞাসা কর আমি স্বেচ্ছাসেবক কিনা তাহা হইলে বলিব তোমরা যাহাকে 'গান্ধীগুণ্ডা' বল আমি তাই।)' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এই কথাগুলি বলিয়াছিলাম—'I am simply gaping with wonder at the truth spoken by these Christian gentlemen after kissing the bible...... As I consider myself a free Indian I deny the jurisdiction of this court set up by the British falsely in the name of law and order. I hope to be released when the prison gate will be opened by the first President of the Indian Republic and that's on the 31st of December. "এই সকল খ্রীষ্টান সার্জেণ্টগণ বাইবেল ছুঁইয়া যে সমস্ত অমূল্য সত্য বলিয়া গেল আমি অবাক্ হইয়া সেইগুলির কথা ভাবিতেছি...... যেহেতু আমি নিজেকে স্বাধীন ভারতীয় বলিয়া মনে করি আমি আইন ও শৃঙ্খলার মিথ্যা দোহাই দিয়া স্থাপিত এই ব্রিটীশ আদালতের অধিকার অস্বীকার করি। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয়

সাধারণ তন্ত্রের প্রথম সভাপতি আসিয়া কারাদ্বার উন্মোচন করিলে আমি বাহির হইব আশা করি।'

"বিচারে আমাদের ৭২ জনের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল। কেবল একটী ছেলের পিতা আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া গেলেন। এই ছেলেটী লালবাজারে রাত্রে খুব গান ও লাফালাফি করিয়াছিল। আমার তখনই সন্দেহ হইয়াছিল, এত উৎসাহ ধোপে টিকিবে না। শাস্তির হুকুম হইবার পরেই সকলে সমস্বরে "গান্ধী মহারাজকী জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনি দিলেন। অমনি "পাগলা ঘন্টী" (alarm) বাজানো হইল। ভলান্টিয়ারগণকে থামাইবার জন্য আমাদের অনুরোধ করা হইল। কোর্টের এবং জেলের অফিসারেরা সকলেই ভদ্র ব্যবহার করিলেন। ইনস্‌পেকটর বাবু করমর্দ্দন করিয়া ক্ষমা চাহিলেন—পোড়া চাকুরীর দায়ে এই সমস্ত অন্যায় করিতে হয় বলিয়া দুঃখ জানাইলেন। আমরা পোড়া চাকরী ছাড়িয়া দিতে বলিলাম।

দেশবন্ধুর কারাগমন—সঙ্গে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি

"১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় বন্ধ হওয়ার পর শুইয়া আছি এমন সময় দেখি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, পদ্মরাজ জৈন, ভোলানাথ বর্ম্মন প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়া আসিলেন। আর এক ওয়ার্ডে মৌলানা আকরম খাঁ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি আসিয়াছেন খবর পাওয়া গেল। তাঁহাদের ওয়ার্ডে

কয়েকজন চীনা ছিল। শুনিলাম আকরম খাঁ সাহেবকে তাহারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—Opium, opium? Cocain, cocain?' অর্থাৎ 'আপিম্' না 'কোকেন' কোনটা চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছ? খাঁ সাহেব ঘাড় নাড়াতে তাহারা আবার বলিল—'Gandi, 'Gandi?' 'গান্ধী' 'গান্ধী' করিয়া আসিয়াছ? তখন তিনি বলিলেন—হাঁ। আপিম কিম্বা কোকেন ভিন্ন আর কি কারণে জেলে আসা হইতে পারে এই চীনাগণ বোধ হয় ধারণাই করিতে পারে না।

"প্রেসিডেন্সী জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডটি মন্দ নয়—উপরে ৫টি cell (কুটুরী), নীচের পাঁচটি বাবুর্চিখানা ও স্নানাদির জায়গা ওয়ার্ডের ভিতরেই। সামনে অল্প একটু জায়গা আছে—চারিদিকে পাঁচির-ঘেরা—একজোড়া হরিণও ছিল। কবিবর ভোম্বলের তো হরিণ যুগল দেখিয়া কবিত্ব জাগিয়া উঠিল—বলিয়া ফেলিলেন

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদবরী তীরে
হরিণ হরিণী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে" ইত্যাদি

মাইকেল যে হরিণ হরিণীকে উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে কপোত কপোতীর স্থানে চড়ান নাই, ভায়ার কবিত্বের ঝোঁকে সে খেয়ালই ছিল না।

"প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিন্টেডেন্ট কর্ণেল হ্যামিলটন ভদ্র ব্যবহার করিতেন। প্রাতে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করিয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিতেন। ওয়ার্ডারের আদেশ অনুসারে বিছানা গুটাইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বড়সাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে হইত। ডাক্তারবাবু আমাদিগকে আগেই নমস্কার করিতেন। ভালমানুষ বলিয়া তাঁহাকে বোধ হইত। সুপারিন্টেডেন্টকে আমরা মুখে Good morning বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে যথোচিত ভদ্রতা করিতেন। জেলর সাহেব মুখ মিষ্টি, অথচ পেটে পেটে দুষ্ট গোছের লোক ছিলেন। তবে আমাদের সঙ্গে কিছু অভদ্র ব্যবহার করেন নাই।

"ওয়ার্ডার ব্রিগস্‌ পূর্ব্বে সেনা বিভাগে কাজ করিতেন। পেন্সন লইয়া জেলের কাজে ঢুকিয়াছেন। বন্দী অপেক্ষা তাঁহারা যে বেশী স্বাধীন এমন মনে হইত না। বেচারা গোঁফ জোড়াটা পাকাইয়া সকলকে ভয় দেখাইতেন। একটা বানান লিখিতে কলম ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। অধীনস্থ সাধারণ কয়েদী বা সিপাহীদের উপর তিনি খুব প্রভুত্ব করিতেন।

"একদিন 'সুপার' আসিতেছেন, এই খবর না দেওয়াতে একজন কয়েদী অফিসারকে খুব ধমকাইয়া ছিলেন। দেখিলাম হিন্দুস্থানী ভাষার সমস্ত বিশ্রী গালাগালি তাঁহার কণ্ঠস্থ। ব্রিগস্‌ সর্ব্বদাই আমাদের বলিতেন—তোমরা যা খুসী কর, দেখো যেন আমার চাকরীর কোনও হানি না হয়। ব্রিগস্‌ চোখে কম দেখিতেন। কয়েদীরা সুবিধা পাইলেই তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া জিব বাহির করিয়া ভ্যাঙচাইত। এসিসট্যাণ্ট জেলর প্রভৃতি সকলেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন।

"প্রেসিডেন্সী জেলের সাধারণ কয়েদীরা আমাদের দেবতার মত ভক্তি করিত। আমাদের বাবুর্চি অথবা বেয়ারার কাজ যাহারা করিত তাহাদের ভক্তি দেখিলে অবাক হইতে হইত। কত প্রকারে যে আমাদের যত্ন করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইত না। জেলের প্যাটের কলে যে সমস্ত কয়েদী কাজ করিতে আসিত তাহারা দূর হইতে ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত আমরা সিগারেট খাই কিনা! শুনিয়াছি পাটের কলে আবগারী বিভাগের গুপ্ত কারবারে হাজার হাজার টাকা খাটিতেছে। গভর্ণমেণ্ট যেমন জেলটাকে ব্যবসার জন্য রাখিয়াছে, জেলের ভিতর কর্ম্মচারী ও কয়েদীগণ সেইরূপ আরও কত ব্যবসাই না ফাঁদিয়াছে। শুনিয়াছি এক টাকা দিলে সিপাহীদের নিকট নাকি আট আনার জিনিষ পাওয়া যায়। ভাল মন্দ কাজ পাওয়ার জন্য ঘুঁষ চলে। থাকার ভাল জায়গায়

জন্ত ভাড়ায় গুপ্ত বন্দোবস্ত আছে। খাবার ভাল পাইতে হইলেও পয়সা খরচ করিতে হয়। জেলের ভিতর মানুষকে নষ্ট করিবার কত রকম বন্দোবস্ত যে রহিয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না।

"এই প্রেসিডেন্সি জেলে আলিপুর বোমার মামলার আসামী শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন। এখানে নরেন গোঁসাইকে গুলি করা হয়। কানাইলালের কথা মনে করিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। ফাঁসির দিন সকালে গভীর নিদ্রামগ্ন কানাইকে জেলর আসিয়া তুলিলেন, হাসিমুখে নির্ভীকভাবে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া কানাই বলিল—'দড়িটা একটু সরাইয়া দাও, আমার দাড়িতে লাগিতেছে।' মৃত্যুকে এমন করিয়া বরণ করা সেই যুগের বাংলার সাধনার মূর্ত্ত প্রতিমা কানাইয়ের পক্ষেই কেবল সম্ভবপর ছিল। আমরা সেই নরদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি। তাঁহার তিরোভাবের স্থানে আসিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল

"১১ই ডিসেম্বর প্রাতে একখানা ট্যাক্সি করিয়া ভোম্বলকে ও আমাকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হইল।

"সেদিন রবিবার, জেলর সাহেব গির্জ্জায় গিয়াছেন। আমাদিগকে জেলের আপিস ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। পলিটিক্যাল প্রিজনা[illegible]দের চার্জ্জে গ্র্যাণ্ট বলিয়া একজন ওয়ার্ডার ছিল। অবশেষে

ভোষল ও গ্র্যান্ট দুই বন্ধুতে পরিচয় হইয়া গেল। জেলরের আপিসে ছোট ডাক্তার বাবু বসিয়া ছিলেন। বিডল নামে আর একজন ওয়ার্ডার আসিয়া পরিচয় দিলেন যে তিনি ট্রাঙ্ক মার্ডার কেসের সেই বিখ্যাত সাক্ষী that man without memory (স্মৃতিশক্তিহীন-ব্যক্তি) যাহাকে শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস শত জেরা করিয়াও উত্তর পান নাই, কারণ সব কথারই তিনি জবাব দিয়াছিলেন 'I don't remember (আমার মনে নাই)।' চীফ ওয়ার্ডার আর্থার রায়ান আসিয়া জানাইলেন যে তিনি জাতিতে আইরিস সুতরাং আমাদের কোন ভাবনা নাই। জেলর উইলিয়ম রায়ান আসিলে আর্থার তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি সি. আর. দাস মশাইয়ের গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া ১৫ মিনিট চুপ করিয়া ভাবিলেন এবং আমরা জেলে আসাতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এখান হইতেই রায়ান সাহেবের সহৃদয়তায় পরিচয় পাই।

"এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে করিলাম জেলে আসিয়া নিতান্ত জলে পড়ি নাই। বড় ডাক্তারবাবু আসিয়া আমাদিগকে ওজন করিলেন ও দৈর্ঘ্য মাপিলেন, ওজন ১৫৮ পাউণ্ড ও দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ ফুট হইল। সংকল্প করিলাম সপ্তাহে এক পাউণ্ড করিয়া বাড়িতে হইবে। পরে আমার সে সংকল্প নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই।

"এইবার আপিসের মধ্যেই জেলের পোষাক পরিতে হইল। আমরা বলিলাম ভিতরে গিয়া কাপড় ছাড়িব, কিন্তু অনুরোধ রক্ষা হইল না। জেলে প্রবেশ করিতে করিতেই লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করিতে হয়।

"আমাদিগকে 'ইউরোপীয়ান প্রিজনার' বলিয়া গণ্য করা হইল। জেলের কোডে আছে, যে সকল লোক সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা ভাল খাওয়া পরায় অভ্যস্ত তাহাদিগকে জেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে 'ইউরোপীয়ান' শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন। চীনা, নিগ্রো, ফিরিঙ্গি

সকলেই জেলে ইউরোপীয়ান বলিয়া গণ্য হয়—কেবল হতভাগা ভারতবাসী ভদ্রলোক সাধারণত এই সুবিধা পায় না। ইউরোপীয় শ্রেণীভুক্ত হইলে খাওয়া পরার এবং কাজের অনেক সুবিধা। ইউরোপীয় এই নামের কি মহিমা!

"প্যাণ্ট, কুর্ত্তা ও টুপি লইয়া আমরা জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে একটি ছোট ওয়ার্ডে আমাদের দুইজনকে রাখা হইল। পরে শুনিলাম ঐটির নাম Female Ward (মেয়েদের ওয়ার্ড)। বাংলায় উহার যে নাম জেলে চলিত আছে, লজ্জার খাতিরে তাহা জানাইতে পারিলাম না। এই ওয়ার্ডে দুইটি সেল (কুটুরী), মাঝে একটি ঘর, সবশুদ্ধ ৬ জন লোক থাকিবার স্থান আছে। আমরা যখন আপিসে বসিয়া ছিলাম, সেই সময়েই দেখিলাম কতকগুলি মেয়ে কয়েদী স্থানান্তরিত হইতেছে। ইহাদিগকে সরাইয়া আমাদের জন্য জায়গা করা হয়।

"আমরা চাহিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেখানে আছেন, সেইখানে থাকিতে। কিন্তু এত জায়গা থাকিতে Female Ward-এ (মেয়েদের ওয়ার্ডে) কোন কুগ্রহে স্থান পাইলাম কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। মহিলাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম বলিয়া বোধ হয় এইরূপ করিয়াছে মনে হইল! তবে পরে শুনিলাম, ভোম্বলের জন্য আমার এই দুর্গতি। লালবাজারে সে খাইল গোরাদের হাতে মার—গবমে'ণ্ট হুকুম দিলেন তাহাকে তফাৎ রাখিতে যেন মারের দাগ কেহ না দেখিতে পায়। আমিতো মার খাই নাই—আমাকেও সঙ্গদোষে অস্থানে পড়িতে হইল!

নির্জ্জন কারাবাস

"চারিদিক বন্ধ—জনমানবের সাক্ষাৎকার নাই। কেবল খাবার দিতে বা তালা আটকাইতে যখন দয়াময় কেহ আসে, তখন মানুষের মুখ দেখা যায়। দরজার গায় একটা চাবি লাগাইবার ছিদ্র ছিল, সেইটি দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতাম।

"দিনে পাঁচীল ঘেরা ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম অথবা মাটীর উপর কম্বল পাতিয়া দুইজনে শুইয়া আকাশের চিল গুনিতাম। তিনখানি করিয়া কম্বল দিয়াছিল, একটি পাতিতাম, দুইখানি গায়ে দিতাম। আর অতিরিক্ত জামাটিতে বালিশের কাজ করিত। আমরা নামে ইউরোপীয়ান, কাজেই ইউরোপ কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি বিলেত ফেরৎ নই বলিয়া অনেকের নিকট উপেক্ষা পাইয়াছি, এবার সরকার বাহাদুরের কৃপায় সাহেবিয়ানার চূড়ান্ত হইয়া গেল। ইউরোপীয় পোষাক, ইউরোপীয় diet (খাবার) ইউরোপীয় বাবুর্চি, এমন কি ইউরোপীয় শীত পর্য্যন্ত ছিল! একে ডিসেম্বর মাস, তাতে মেঘলা ছিল—আমাদের অন্ধকার কারাগৃহের শীত, ইউরোপের শীতকেও হারাইয়া দিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে একখানা বেশীর ভাগ কম্বল চাইলাম, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন জেলের আইনে দেবার হুকুম নাই। সর্দি কাশীতে অস্থির হইলাম, অবশেষে গরম জামা পাইলাম। আমাদের খানার একটু নমুনা দিই। পরে শুনিয়াছিলাম ইহারই নাম ইউরোপীয়ান diet (খাদ্য)!

ভোরে উঠিয়া ছোট হাজরী, একমগ চা, আধখানা পাউরুটি ও কিছু মাখন মিলিত। চায়ের চেহারা দেখিয়া মনে হইত, গোশালা হইতে বস্তুবিশেষ মগে করিয়া আনা হইয়াছে! মাখনটা কি দিয়া প্রস্তুত ছিল তাহা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। পেটের জ্বালায় খানিকটা খাইয়া বাকিটা মেথরকে দিতাম। বেলা ১১টার সময় "ব্রেক-ফাষ্ট্"—মোটা চালের দুটি ভাত, আধসিদ্ধ দুটি ডিম, খানিকটা ডাল ও একটা চালকুমড়ার ঘ্যাঁট আসিত। কোনদিন ইহার ব্যতিক্রম হইবার জো ছিল না। চালকুমড়ার তরকারীর এমন একটা গন্ধ ছিল যে, অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠিয়া আসে। আমার নাকে সেই গন্ধটা দিনরাত লাগিয়া থাকিত। ডালগুলি জলে সিদ্ধ করা হইত, কিন্তু দানাগুলি দেখিলে মনে হইত যেন হাসিয়া আমাদিগকে ঠাট্টা করিতেছে। আমি তো চোখ কান বুঁজিয়া ডিম ও ভাত খাইতাম, কিন্তু ভোম্বল ভায়া অপরাজেয় ছিলেন; আমার পরিত্যক্ত চালকুমড়ার তরকারী পর্য্যন্ত লইয়া গোগ্রাসে গিলিতেন। এরই নাম পেটের জ্বালা! বিকাল ৫টার সময় "ডিনার"—দুইখানি হাতরুটি, কয়েক টুকরা হাড় মাংস তাহাতে আলুর বদলে প্রায়ই কচু দেওয়া ও পূর্ব্ব বর্ণিত চা আসিত। মাংস জড়িত হাড় পরিষ্কার করিতে করিতে চোয়াল ব্যথা হইয়া যাইত। এক একদিন লম্বা টুকরা লইয়া tug of war (দড়ি টানাটানি) করিতাম! একদিন তো ওয়ার্ডার সাহেব বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহারও দেখা নাই! ক্ষুধার চোটে নাড়ী বাপান্ত করিতেছে! আগের দিন বেলা সাড়ে চারটায় খাইয়াছি আর আজ ১টা বাজিয়া গেল! গুর্খা প্রহরীকে বলিলাম জেলর সাহেবকে খবর দিতে, সে দয়া করিয়া জানাইল যে আমাদের সহিত কথা বলার হুকুম নাই! অবশেষে পাহারা বদলের সময় খবর পাঠানো গেল। জেলর আসিয়া বাগান

হইতে বেগুন লইয়া ঘানি হইতে তেল আনাইয়া ভাজাইয়া দিলেন। তৎসঙ্গে বোধহয় কাহারও পাতকুড়ান শুকনো ভাত দুটি পাওয়া গেল। ঐ অল্প অনুগ্রহের জন্যই ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। বিকালে খাওয়ার পরই সাড়ে পাঁচটার সময় ঘরে বন্ধ করিয়া যাইত। এক একটী মশা ওজনে একছটাক হইবে—আর এইরূপ মশার বাহিনী যে কতগুলি আমাদের ঘরে ছিল, তাহা বলা যায় না! নাকটুকু মাত্র বাহির করিয়া ঘুমাইতাম, প্রাতে উঠিয়া দেখিতাম নাকের ডগা শরীরের সহিত অসামঞ্জস্য করিয়া অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। দিনমানে ঘুম দিতাম—জীবন প্রণালী সমস্তই উল্টাইয়া লওয়া গিয়াছিল। সকালে শীতের উৎপাতে স্নান হইয়া উঠিত না—বিকালে স্নান করিতাম। জেলের নিয়ম অনুসারে সকাল হইতে দশঘন্টার মধ্যে ৩বার আহার—আর বিকাল হইতে সকাল পর্য্যন্ত উপবাস। দুইখানি রুটি ও কয়েক টুকরা মাংস খাইয়া কোনও কোনও দিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যাইত, চারিদিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই শীতের রাত্রে জল খাইয়া দগ্ধোদরকে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে আদেশ করিতাম। ভাগ্যি দুজনের ঘুম দেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল, তাই তেমন দুঃখ পাই নাই। শুনিতাম আমাদের নাকডাকার শব্দে প্রহরীদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। ভোম্বলের নাক ভীষণভাবে ডাকিত আমি নিজে শুনিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের নাক ডাকিতে তো কোনও দিন শুনি নাই।

"ক্র্যাডক বলিয়া একজন ইংরাজ কয়েদী আমাদের বাবুর্চির কাজ করিত। সে আগে Flying Corps-এ অফিসার (উড়োজাহাজের কর্ম্মচারী) ছিল। পরে কলিকাতায় বার্ড কোম্পানীতে কাজ করার সময় false cheque (জাল চেক) লেখার জন্য একবৎসর শ্রীঘর বাসের

আদেশ পায়। এই ক্র্যাডক এবং ছোট ডাক্তার বাবুর শ্রীমুখ দর্শন আমাদের নিত্য-কাজ ছিল।

"আয়না ছিল না—আমার মুখ ভোম্বল দেখিত, ভোম্বলের মুখ আমি দেখিতাম। প্রথম দিন তো অদ্ভুত খালাসীর পোষাকের মত পোষাক পরিয়া পরস্পরকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কাটাইলাম। তারপরদিন এইরূপ পোষাকে জনৈক কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় নেতাকে কিরূপ দেখাইবে ইহা ভাবিয়াই হাসিয়া কাটাইলাম। খাতা, পেন্সিল, কাগজপত্র, বই কিছুই ছিল না, যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতাম, সময় কাটানো তো চাই। যে সকল গুর্খা পাহারা দিত, আমাদের সঙ্গে কথাবলা তাহাদের পক্ষে নিষেধ ছিল। একদিন একজন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'গান্ধী মহারাজের রাজ কবে হইবে?' তখন বুঝিলাম ইহারা বাংলা জানে এবং সকলেই আসামের লোক, গুর্খা নয়। ইহারা লোক ভাল ছিল, ক্রমশঃ বেশ আমাদের বশ হইয়া গিয়াছিল।

"ভোম্বলচন্দ্রের মুখখানা ক্রমশঃ একঘেয়ে হইয়া উঠিল। মুখদর্শন তবুও সহ্য করা যায়, কিন্তু তাহার নব-রামপ্রসাদী সুরের গানের জ্বালায় ঘরে টেকা দায় হইল। এমন সময় একদিন বাড়ী হইতে সকলে দেখা করিতে আসিলেন। ভোম্বলকে লইয়া গেল। আমাকে আর দেখা করিতে দিল না। ঘড়ি ধরিয়া ১৫ মিনিটের পর আবার ফিরাইয়া আনিল। তখন ৩ মাসে একবার interview (দেখা) ও একখানা চিঠি লেখার নিয়ম ছিল। পরের সপ্তাহে আমাদের দুজনের সঙ্গেই বাড়ীর সকলের দেখা হইল। আমরা আসিবার পূর্ব্বে একটা লোহার তারের খাঁচা বিশেষের ভিতর সাধারণতঃ interview হইত। আমাদের জেলরের ঘরেই বসিতে দেওয়া হইয়াছিল।

"ইতিমধ্যে সহরে গুজব রটিল ভোম্বলকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। জেলে সন্ধ্যার মধ্যে কতবার কতলোকে টেলিফোন করিল, অফিসাররা

তো মহা বিব্রত। স্যার হেনরী হুইলার হইতে আরম্ভ করিয়া কতজনে খবর চাহিলেন। কংগ্রেস অফিসে শুনিলাম লোকের ভীড় আর শেষ হয় না। দেওয়ালে লিখিয়া দেওয়া হইল—ভোম্বল মরে নাই। প্রাতে শ্রীযুত নিশীথ সেন ও শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় সুপারের সহিত ভিতরে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন যে ভোম্বল সশরীরে জীবিত আছে। এদিকে কাউন্সিলের মেম্বররা এতদিন একটা কিছু করিতে পারিতেছিলেন না—এইবার একটা বিষয় পাইলেন। ভোম্বলের সম্বন্ধে কাউন্সিলে অনেক প্রশ্ন উঠিল। গভর্মেণ্ট সাফ জবাব দিলেন যে তাহাকে মারা হয় নাই! আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের মেডিকেল এগজামিনেসনের রিপোর্ট পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল যে মারের কোনই চিহ্ন নাই! এই মেডিকেল এগজামিনেসন কখন যে হইয়াছিল ভোম্বলও টের পায় নাই, আমিও দেখি নাই। জেলের কাণ্ডই সব অদ্ভুত!

"এদিকে নির্জ্জনবাসে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সুপারের কাছে বই চাহিলাম। বাড়ী হইতে কিছু 'নির্দ্দোষ' বই আনিবার অনুমতি পাওয়া গেল। আয়না, চিরুণ, সাবান, সেফ্‌টি রেজর প্রভৃতি আনার অনুমতি পাইলাম। খাতা পেন্সিল পাইলাম। সাতদিন চাহিয়া একটু দাঁতমাজন ও একটা টীনের মগ পাইয়াছিলাম। এখন সময় মন্দ কাটিতে লাগিল না।

"এই দশদিন সত্য সত্যই জেল খাটিতে হইয়াছিল। থালা ধোওয়া, বিছানা তোলা, কাপড় কাচা সমস্তই করিতে হইত। একদিন লুকাইয়া সামান্য পরিমাণ পানের মশলা পাইয়াছিলাম। কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাই নাই। একবার জামার ভিতর একবার ঘরের কোণে এইরূপে কত শঙ্কিত ভাবে রাখিতে ছিলাম। তারপর ক্র্যাডক আসিয়া শিখাইয়া দিয়া গেল যে জেলের দেওয়া বেনিয়ানের বুকের নিকট যে দু'পর্দ্দা

কাপড় আছে, তাহার ভিতরকার পর্দা ছিঁড়িয়া পকেট করিতে। চীনা কয়েদীদের নিকট সে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিল। চীনাদের মাথা আছে বটে! জেলের পোষাকে পকেট থাকে না একথা বলিয়া রাখি। আর একজন হাসপাতালের কয়েদী ঔষধ দিতে আসিয়া বলিয়া গেল—"ডাক্তারবাবুকে বলুন যে কোমরে ব্যথা তাহা হইলেই হাঁসপাতালে পাঠাইবে, সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হইবে"। ডাক্তারবাবু আসিলে ভোম্বলের কোমরে বেদনা হইল। 'সুপার' বলিয়া গেলেন ঘরেই চিকিৎসা করিতে, কাজেই একবার মালিশ করিয়া বেদনা সারিয়া গেল।

"সময় কাটিবে বলিয়া কাজের জন্য সুপারকে বলিলাম। তিনি বলিলেন 'Take rest my dear boys, you had had enough work outside (এখন বিশ্রাম কর, বাইরে তোমরা অনেক কাজ করেছ)।' আমরাও আর পীড়াপীড়ি করিলাম না। পরে ওয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া দেখিয়াছিলাম কাগজে আটা দিয়া পাতলা কাপড় লাগানো, খাম আঁটা প্রভৃতি কাজ অন্যান্য সকলকে দিত। ইহা হইতে তিনপ্রকার শিল্পেরও উদ্ভব হইয়াছিল! দু'একজন গান্ধী টুপি, চটীজুতা ও একসাইজ বুক তৈয়ারী আরম্ভ করিল।

"ইতিমধ্যে জেলের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্যার আবদুর রহিম ও ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব্ প্রিজন্‌স্ টমসন সাহেব একদিন আমাদের দেখিতে আসিলেন। তাঁহার শুভ পদার্পণের ফলে এক একটা মশারি পাইলাম। আমরা যাহার উপর শুইতাম সেই জিনিষটা ইঁটে গাঁথা, এক হাত চওড়া একটা কবরের মত। মাথার দিকে খানিকটা উঁচু করিয়া গাঁথা—বালিশের কাজ করিবে বলিয়া। এই কবরটা রাত্রে এক একদিন এমন ঠাণ্ডা হইয়া যাইত যে আমরা ভাবিতাম পরদিন সকালে নিজের জীবন্ত সমাধি হয় তো স্বচক্ষেই দেখিতে হইবে। কিছুদিন পরে লোহার খাট দিয়াছিল।

ক্রমশঃ সুখের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। একটা বিচালির গদিও পাওয়া গিয়াছিল! তাহার সঙ্গে কয়েকশত ছারপোকাও মিলিয়াছিল!

'রাত্রে দণ্ডে দণ্ডে প্রহরীরা আসিত এবং জানালার ভিতর দিয়া আলো ফেলিয়া দেখিত আমরা আছি না পলাইয়াছি! তাহাদের বিকট জুতার শব্দ, তালা নাড়ার আওয়াজ, মুখের উপর আলো ফেলা এবং মশা ছারপোকার কামড় ও দারুণ শীত, তৎসঙ্গে কোনও কোনও দিন মাঝরাত্রে ক্ষুধা, রাত্রি কাটাইবার বড়ই সুবিধা করিয়া দিয়াছিল!

"কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আইন অমান্য করিয়া সভা করা স্থির করিয়াছেন। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, চারুলতা দেবী প্রভৃতির নেতৃত্বে প্রত্যহ কলিকাতায় নানাস্থানে সভা হইতে লাগিল। পুলিশ সভা সুদ্ধ লোককে ঘেরাও করে লাঠি চালায়, মেয়েদের গায়ে পর্য্যন্ত হাত দেয়—তবুও লোকে শান্ত থাকিয়া দলে দলে ধরা দেয়। পুলিশ 'লরী' বোঝাই করিয়া বেড়াল পার করার মত মাঠে গিয়া সকলকে ছাড়িয়া দেয়। আদালতে হাজির করিলেও কম শাস্তি দেয়। জেলে জায়গা হয় না। ছোট ছোট ছেলেরা সভাপতি হইয়া বক্তৃতা দেয়। গভর্মেণ্ট অর্ডার দিলেন ছাত্রদের ছাড়িয়া দাও, তাহা না হইলে 'গোলামখানা' ভাঙিয়া পড়ে। কত বৃদ্ধ প্রৌঢ়কে ছাত্র বলিয়া ছাড়া হইল। আগে লোকে জেলে আসিতে ভয় পাইত এখন খালাসের দিনে কয়েদী খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ১৬ বৎসরের কম বয়েসের ছেলেদের জেলের দরজা হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার হুকুম আসিল। ছেলেরা আসিয়া কম বয়স স্বীকার করে না—জেল কর্তৃপক্ষ মেডিকেল এগজামিনেসন্ করিয়া ছাড়িতে চায়, তাহারা কিন্তু যাইতে চায় না। এক একজন ২।৩ বার জেলে আসিয়াছে। সুপারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইল ছয়মাসের কম শাস্তি যাহাদের তাহারা একটা undertaking দিলেই ছাড়া পাইবে। অনেক ভলাণ্টিয়ারের দণ্ড হ্রাস হইয়া গেল—কেবল নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের পুরাই রহিল।

"তখন বাংলার হিন্দু মুসলমান সকল নেতাই প্রায় জেলে আসিয়াছেন। ভলান্টিয়ারদের চীৎকারে গোলমালে এবং ন্যায়সঙ্গত অবাধ্যতায় জেল কর্তৃপক্ষ অস্থির হইয়া উঠিলেন। জায়গার অভাব, পোষাক দিতে পারেন না, কম্বল নাই, খাবার বন্দোবস্ত হয় না, কি করেন?

"একজন সাধারণ কয়েদী 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করাতে সুপার রুলের গুঁতা দেন। তাহাতে সে সাহেবকে ধরাশায়ী করে—তখনই পাগলা ঘণ্টা (alarm bell) বাজানো হইয়াছিল—ফোর্ট হইতে মেসিনগান লইয়া ৯০ সংখ্যক পাঞ্জাবী এবং রয়াল ওয়েষ্ট কেণ্ট (Royal West Kent) সেনাদল জেল ঘিরিয়া ফেলিল! ইহাকেই বলে মশা মারিতে কামান দাগা!

"এদিকে আমরা স্বরাজের স্বপ্নে মশগুল! স্বরাজ হইলে কে কি পোষ্ট লইব, তাহার চিন্তাতেই সময় যায়। কাহাকে জেলে আনিতে হইবে, কাহাকে 'অহিংস' ফাঁসী দিতে হইবে—ইত্যাদি সমস্ত ঠিকঠাক!

আমেদাবাদ কংগ্রেস

"আমেদাবাদ কংগ্রেসে যে যাইবই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। লর্ড রেডিং ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কলিকাতায় আসিয়াছেন—গোল টেবিলের বৈঠকের কথা চলিতেছে; আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই খালাসের আশা করিতেছি। এক একখানা মোটরের শব্দ শোনা যায়, আর ভাবি 'ঐ বুঝি আমাদের নিতে এসেছে'। ২২শে ডিসেম্বর গভমের্ণ্টের সঙ্গে

কথাবার্ত্তা যেখানে আসিয়া পৌঁছিল—তাহাতে মুক্তির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া গেল। হরতাল বন্ধ করা হইবে, ভলাণ্টিয়াররা ছাড়া পাইবে—পরে গোল টেবিলের বৈঠক হইবে—দেশবন্ধু মহাত্মাকে তার করিলেন, মহাত্মাজী রাজী হইলেন না। আমাদের সব আশা ভরসা ফাঁসিয়া গেল! ২৪শে ডিসেম্বর পুরা দস্তুর হরতাল হইল, এবার ভলাণ্টিয়ার বাহির করা হয় নাই—লোকে নিজে হইতেই শান্তিপূর্ণ হরতাল করিয়াছিল। গভমেণ্ট violence এবং intimidation (জোর জবরদস্তি ও ভীতিপ্রদর্শনের) দোহাই দিতে পারিলেন না। জেলে সেদিন বুদ্ধিমান গভমেণ্ট ছুটি দিয়াছিলেন। আমরা সকলে উপবাস করিয়া হরতাল করিয়াছিলাম।

জেলে হরতাল

"গোলমাল থামাইতে আমাদিগের সাহায্য জেলকর্তৃপক্ষ প্রার্থনা করিলেন। তখন আর কেমন করিয়া বন্ধ রাখিবেন? আমাদের মধ্যে দশজনকে এক ওয়ার্ড হইতে আর এক ওয়ার্ডে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল। প্রথমে যে সমস্ত ভলাণ্টিয়ার আসে, তাহাদের মধ্যে ১৮ জন ভোম্বলের এবং ৭২ জন আমার সঙ্গে জেলে আসিয়াছিল। তাহারা সকলেই আমাদের ভালবাসিত এবং কথা শুনিত। আমরা গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে অনেক কষ্টে কয়েকদিন পরে গোল থামিল।

"এইবার খাবার লইয়া যুদ্ধ বাধিল। 'ইউরোপীয়' খাদ্যের সুখভোগ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিতে হইল! তখন যে খাবার সকলকে দেওয়া হইত তাহা গোরুর অখাদ্য। এক একটী চালের কি চেহারা—যেন কুস্তিগীর পালোয়ান—চিবাইতে হইলে আর একজন চোয়াল ধরিয়া নাড়িয়া দিলে ভাল হইত—তাতে চেতন-অচেতন কত পদার্থ থাকিত! কাঁকড়, কাঠের টুকরা, মাছি, চুল, পোকা—কত না জিনিষ মিলিত! ডালে ডুবুরী নামাইয়া দানা তুলিতে পারা যাইত কিনা সন্দেহ! মূলোর পাতাটাতা সুদ্ধ জলে সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত উপায়ে প্রস্তুত পদার্থকে তরকারী বলা হইত। একটু তেঁতুল দয়া করিয়া দেওয়া হইত—আমাদের ভরসা সেইটুকুই ছিল। বেলা বারোটার সময় এই নবাবী খানা খাইয়া আর আহারে অভিরুচি থাকিত না। যাহারা খাবার লইয়া আসিত, তাহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অথবা পাকশালার অবস্থা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভাত মুখে তোলাই মস্ত বড় সাধনার বস্তু ছিল।

"টিনের খোলা বাক্সে ভাত, বালতিতে ডাল, টিনের ডাবুতে করিয়া মাপা ডাল ও তরকারী খাইতে খাইতে পুলকে অশ্রুপাত হইত। একখানি লোহার থালাতে ভাত আর একখানিতে জল খাওয়া ও অন্য সমস্ত কাজ সারা রীতি ছিল। সকালে বিখ্যাত 'লপসি'—আর দুপুরে বিকালে ভাত অথবা রুটি দিত। সকলে মিলিয়া 'লপসি' খাওয়া বন্ধ করা গেল। সুপার দায়ে পড়িয়া রুটিগুড়ের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর পাকশালার ভার আমাদের হাতে আসিল। চুরি বন্ধ হওয়াতে খাবার অনেকটা ভাল হইল। ইতিমধ্যে সরকার ভদ্রলোক কয়েদীদের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নির্ব্বিশেষে special class prisoners (বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়েদী) বলিয়া ভাল খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করিবেন, শোনা গেল। আমরাও সেই আশায় আর তত কিছু গোলমাল করিলাম না।

"এই সময়ে শ্রীযুত সাতকড়ি রায় আসিয়া আমাদের ওয়াডে' জুটিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ ছিল—organising an illegal assembly on the Harrison Road in a motor car (হারিসন রোডে মোটর গাড়ীতে বসিয়া বে-আইনী সমিতি গঠন করা) আমি বলিতাম 'in a motor car on a tree' 'গাছের উপর মটর গাড়ীতে বসিয়া' বলিলেই চার্জ্জটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত! প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট জে. এন. সরকার মহাশয় বিচার করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মাবতারের হাতে আমাদের দণ্ড হয়। সাতকড়ি বাবু পূর্ব্বে ইহার সহিত এক সঙ্গেই এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে ছিলেন। যাহা হউক সাতকড়িবাবু খালাস পাইলেন।

"সাতকড়িবাবুর সহৃদয়তা এবং স্নেহাধিক্যে মুস্কিলে পড়িতে হয়। সকলকে না খাওয়াইয়া তিনি খাইতেন না। মাছ, মাংস বাল্যকাল হইতে খান না, কিন্তু রন্ধনে বিশেষ পটু ছিলেন। আমরা খাইতাম ও সাতকড়ি বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতাম—'কারো খেয়ে সুখ, কারো খাইয়ে সুখ'। সাতকড়িবাবু খালাস পাইলে one, two, three, এক-দুই-তিন করিয়া সকলে একযোগে মরাকান্না কাঁদিয়াছিল"।

সুভাষের প্রথম কারাদণ্ড

এদিকে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধু ও সুভাষ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী জেলে আমরা থাকতে থাকতেই দেশবন্ধু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আকরম খান, শ্রীযুত বীরেন শাসমল

প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়ে এলেন। আমি ও ভোম্বল (চিররঞ্জন দাস) শাস্তি প্রাপ্ত আসামী বলে সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হলাম। ৭ই ফেব্রুয়ারী সুভাষও সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হ'য়ে এল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধু ও শাসমলের ছয়মাস সশ্রম-কারাদণ্ড হ'ল। সুভাষেরও কয়েকদিন আগে ঐরূপ দণ্ড হ'ল। সুভাষ দণ্ডাদেশ শুনে বলেছিল—'Have I robbed a foul ?' (আমি কি মুর্গী চুরি করেছি ?)

শাসমল মশায়ের বর্ণনা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় "স্রোতের তৃণ" নামক পুস্তকে লিখেছেন :—

"সাজা পাওয়ার পর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার হয়ে কোনদিন বা আমি সকাল বেলায় উঠেই হালুয়ার বর্ণনায় নিযুক্ত হতাম এবং 'গোল্লা খেয়ে মোল্লা মশায় ধরলেন গান মল্লারে' বলে গান গাইতে সুরু করলেই, হেমন্তবাবু তাঁর দুটি স্বভাবসুন্দর বড় বড় চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কোন দিন বা আমারই তোয়েরী দুপুর বেলার নাক-লজি' * এবং রাত্রের 'কক্কের কাভা' † নিয়ে সকলে এত হাসাহাসি করতাম যে তার আওয়াজ জেলের ওপারে জেলের ছোট ডাক্তারের বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছা[illegible] তবে একথা স্বীকার কর্তে'ই হবে যে রসিকতায় হেমন্তবাবুকে [illegible] দেওয়া আমাদের কারুর সাধ্য ছিল না, কারণ তিনি তো

* নাক-লজি — নাকে খত দিয়ে এপোলজি

† কক্কের কাভা — লাল মানুষের রক্তের আভা থেকে কাল মানুষের কক্কের কাভা

বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেনই তার উপর জিতেনবাবু তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন—তাঁর 'হেড' বা মস্তিষ্কের লাইন তাঁর 'হার্ট' বা হৃদয়ের লাইনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। এখন ইতিহাসে দেখা যায় যে এ জগতে একটি বিযুক্ত 'হেড্' বা একটি বিযুক্ত হার্টের ঠেলা সামলাতে গিয়ে বহুলোককে বহুবার ধরাশায়ী হতে হয়েছে ; সুতরাং তাঁর সংযুক্ত হেড্ ও হার্ট নিয়ে হেমন্তবাবু যে আমাদের সকলকেই অবহেলায় ভূতলশায়ী করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? হেমন্তবাবুর পাকা হাতের লক্লকে চাবুকখানি এখানে বেশীর ভাগই চোর ও ভূতসম্প্রদায়ের উপর পড়'তো। সেজন্য শুনেছিলাম—এ জেলের অনেক ভদ্রলোক তাঁর 'ক্লিপ্টোম্যানিয়া' পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং কোন কোন দুরন্ত ভূতও ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি করে বুদ্ধিমান ভাল ছেলের মত কায়া পরিবর্ত্তন করেছিল।

"সুভাষবাবু ও অরবিন্দ বাবুর আদর যত্নের কথা, কালে জনশ্রুতিতে পরিণত হ'তে পারে। সুভাষবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা ইতিমধ্যে বলেছি, সুতরাং এখানে আর তাঁর বিষয় কোন কিছু বলবো না। কিন্তু এখানে অরবিন্দের লুচি ভাজা থেকে আরম্ভ করে মাছ মাংসের তরকারী রান্না করা পর্য্যন্ত কোন কোন কথার উল্লেখ না করলে, তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে। এই ভদ্রলোকটি ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠেই সেই যে চা তোয়েরিতে লেগে যেতেন এঁর সে কাজ শেষ হতো একবার দুপুর বেলায় একটু বিশ্রামের সময় এবং শেষে খেয়ে দেয়ে শুতে গেলে। বাংলার নবযুগের এই সেবাব্রতধারী ক্রিয়া কলাপ দেখলে সত্যই দেশের নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীব্র আশার সঞ্চার হয়। সুতরাং এঁদিগকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, সে কথা বিস্তারিত বর্ণনা করবার আবশ্যক নাই।"

জেল হতে খালাস

আলিপুর জেলে একঘরে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, শাসমল, চিররঞ্জন, কিরণশঙ্কর, অরবিন্দ ও আমি ছিলাম। ১৯২২ সালে জুন মাসে ৬ মাস পূর্ণ হবার ছয়দিন আগেই আমি জেল থেকে মুক্তি পাই। দেশবন্ধু ও সুভাষ আগষ্ট মাসে খালাস পান। সুভাষকে ছুদিন বাকী থাকতে ছেড়ে দেয়।

শরৎচন্দ্রের রসিকতা

জেলে আসার আগে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২১ থেকে ক্যাপ্টেন সুভাষচন্দ্র ৪ জন করে ভলান্টিয়ার পাঠাতো। আমার ধরা দিতে বেরোনোর একটু আগে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অফিসে এলেন। আমাকে পাঠাতে দেখে শরৎচন্দ্র সুভাষকে বললেন—"এত মুসলমান ভলান্টিয়ার থাকতে, সুভাষ এই ভদ্দর লোকের সন্তানটিকে জেলে পাঠাচ্ছ কি বলে? ওদের চেহারা দেখলেই যেন মনে হয় ভগবান ওদের জেল খাটার জন্য সৃষ্টি করেছেন! ওরা জেলে

গিয়ে এ ক'টা দিন ঘানি ঘুরোক, তারপর ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ হ'লে ওদের ফাঁসি দিয়ে দিলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! কথা শেষ করেই শরৎদা দেখলেন কাছেই মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে শরৎদা ভয় পেয়ে গেলেন—চুপি চুপি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন—"শামসুদ্দীনের কাছে ছোরা নেই ত!" তারপর মৌলবী সাহেবকে বললেন, "ও শামসুদ্দীন তুমি এখানে আছ, জানতাম না, আমি কি বললাম শুনেছ না কি? ওসব ভাই কিছু নয়, ইংরাজ আসার আগে তোমরাই বাদশা ছিলে, স্বরাজ হলে আবার তোমরাই রাজা হবে, তাই তোমাদের জেলে পাঠাতে বলছিলাম।"

এর আগে একদিন বি. পি. সি. সিতে শরৎদা এলেন দাড়ি কামিয়ে। দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপারখানা কি?" শরৎদা বললেন, "আর মশায় বলবেন না, হাওড়ায় ষ্ট্রাইক চলছে, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলে আমায় সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট তলব করলেন, তাঁর বাংলায় গেলে আমার লম্বা দাড়ি দেখে "মিঞা-সাহেব" বলে সম্বোধন করলেন। কোন রকমে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরে আমার চল্লিশ বছরের পোষা দাড়ি কামিয়ে ফেললাম!"

আমরা জেলে থাকতে শরৎদা একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, দেখো জেল জায়গাটা আমার কেমন পছন্দ হয় না, জেলে দুধ আফিং প্রভৃতি পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন—"আমি

জুতোর শুকতলার নীচে আফিং ভরে এনেছি, কি জানি বাবা, তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্তে এসে ধরে না রাখে।'

গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনে "শিক্ষার বিরোধ" নামে একদিন একটা প্রবন্ধ শরৎদা পড়েন। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার-মিলন" নামক প্রবন্ধের জবাব। পরে শরৎদার প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক "বাংলার কথা"য় বেরোয়। শ্রীযুক্ত কিরণ-শঙ্কর রায় ঐ কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখে গ্রেপ্তার হ'ন। তাঁর হাতের লেখা প্রমাণ না হওয়ায় তিন মাস হাজত বাস করার পর ছাড়া পান। "বাংলার কথা"র প্রিণ্টার ও পাবলিসার হিসাবে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মুখার্জ্জি ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। অরবিন্দ আমাদের সঙ্গে জেলে থেকে কি সেবাই না করেছিলো।

সুভাষের সেবা

জেলের টিকিটে দেশবন্ধুর পাচক হিসাবে নাম ছিল সুভাষের এবং চাকর হিসাবে নাম ছিল আমার। তখনকার বাংলা গভর্ণমেণ্টের মেম্বর ইন্‌চার্জ্জ অব্ জেলস্ স্যর আবদুর রহিম জেল দেখতে এসে দেশবন্ধুকে বলেছিলেন—"C.R., you are a very expensive prisoner. An I. C. S.

is serving you as cook and a University Lecturer as your servant !"

সুভাষের সেবার তুলনা হয় না। গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে এসে শাসমল জ্বরে পড়েন। সুভাষ তাঁকে কি ভাবেই না শুশ্রূষা করে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কিরণবাবুর বসন্ত হয়। তাঁর সেবা করতে গিয়ে আমাকেও ঐ রোগে ধরে। কিরণবাবু তখনও সুস্থ হ'ননি, সারা-রাত বসে আমায় হাওয়া করেছিলেন, মনে পড়ে। সুভাষ এসে আমার সেবার ভার নিল। বসন্তের ঘাগুলো ধুয়ে দেওয়া, তাতে ওষুধ লাগানো, আমাকে খাইয়ে দেওয়া, বাতাস করা—সে সেবা জীবনে আর পাবো না। ইটের গাঁথা কবরে সেই অবস্থায় শুয়ে থাকতে পারতাম না। আমাকে স্বস্তি দেওয়ার জন্যে সুভাষ তার কোলে আমার মাথাটি নিয়ে সারারাত কাটিয়েছে।

জেলে বসন্ত

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বসন্তরোগীদের নিয়ে মাঠে তাঁবুর নীচে একগাছি মোটা শিকল দিয়ে অনেককে একসঙ্গে পায়ে বেঁধে রাখা হত। চিকিৎসার মধ্যে ফিনাইল মিশ্রিত জল গায়ে দেওয়া হ'ত। আমাদের ওখানে নেওয়া হয়নি—

কারণ রাজনৈতিক বন্দী ও সাধারণ বন্দীদের একত্র থাকার সুযোগ দিতে কর্ত্তারা রাজি ছিলেন না।

আমাকে বসন্তের জ্বরের জন্য কুইনাইন মিকৃশ্চার খেতে দেওয়া হয়েছিল। ছোট ডাক্তার বলতেন ওটা ফেলে দিতে এবং বড় সাহেব এলে বলতে যে খেয়েছি।

'সুপারে'র ঘরে আমাদের বাইরের আত্মীয় বন্ধুগণের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হ'ত। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, কল্যাণী দেবী, মায়া দেবী প্রভৃতি অনেকে আমাদের দেখতে আসতেন। একদিন বাসন্তী দেবী এসে আমায় জানালেন যে আমার অনুরাগিনী মেয়েটি, আমি যা' যা' খেতে ভাল বাসতাম, সেই সমস্ত জিনিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সে জেলে আসতে অনুমতি না পেয়ে বড়ই দুঃখে আছে। একদিন জাপানী ধরণের বাঁধা একসেট ৫০৲ টাকা মূল্যের রবীন্দ্র-কবিতাবলী আমার জন্মদিনে উপহার স্বরূপ জেলের মধ্যে পেলাম। বইখানা পড়তে পড়তে ভিতরে একখানা চিঠি পেলাম—সেই মেয়েটি লিখেছে। এখন বুঝলাম ব্যাপারখানা কি। সুভাষকে এবং দেশবন্ধুকে চিঠিখানা দেখালাম। সুভাষের খুব ইচ্ছা ছিল আমি বিয়ে করি এবং সেই মেয়েকেই করি। দেশবন্ধুও এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত দিলেন। জেলের ভিতর মেয়ের মা ও মেয়েকে ডাকানো হ'ল। মেয়ের মা কিন্তু সুভাষের উপর জ'ক্ করে ছিলেন। শেষপর্য্যন্ত এই বিবাহ কিন্তু হয় নাই।

কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব

জেলে থাকতে একটী চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ১৯২১ সালের গুডফ্রাইডের ছুটীতে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সভানেত্রী হ'ন। জেল থেকে বেরিয়ে কাউন্সিলে প্রবেশ করা দেশবন্ধুর মত হ'ল। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি এর বিরোধী হ'লেন। দলাদলির পরিণাম এমন দাঁড়াল যে শ্যামসুন্দরবাবু দেশবন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করলেন। মৌলানা আজাদ, আকরম খান প্রভৃতি কোনদিকে মতামত দিলেন না। সুভাষচন্দ্র চুপ ক'রে থাকলো। আমাকে দেশবন্ধু বাসন্তী দেবীর বক্তৃতা লিখে দিতে আদেশ করলেন এবং কাউন্সিলে প্রবেশ সমর্থন ক'রে লিখতে বল্‌লেন। আমি সেই মতো লিখলাম এবং দেশবন্ধুকে লেখাটি দেখিয়ে বাসন্তী দেবীর হাতে দিলাম। চট্টগ্রাম কনফারেন্সে যেন bomb shell পড়লো। সকলেই বুঝলেন বাসন্তী দেবীর বক্তৃতার পিছনে যে দেশবন্ধুর সমর্থন আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি জেল থেকে বেরিয়ে "স্বরাজ কোন্ পথে" বলে একখানি পুস্তিকায় কাউন্সিল প্রবেশ সমর্থন করে একটী প্রবন্ধ লিখলাম। দেশবন্ধু তখনও খালাস

পান্‌নি। শ্রীযুক্ত বিপিন পাল মশায় "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় এই পুস্তিকার উল্লেখ করে লিখলেন. "বহ্নিমান্ ধূমাৎ", দেশবন্ধু বাইরে এসে যে কাউন্সিল প্রবেশ নীতি সমর্থন করবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই!

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকতে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। রাশিয়া থেকে নলিনী গুপ্ত হাঁটা পথে এসে মুসলমান ব্যবসায়ী সেজে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। ভারতে বিপ্লব করতে পারলে রাশিয়া থেকে বহুলক্ষ টাকা এনে দেওয়ার কথা জানালেন। আমি ও সুভাষ রাজি ছিলাম, কিন্তু দেশবন্ধু রাজি হ'লেন না। এই নলিনী গুপ্তই শরৎ চাটুয্যে মশায়ের "পথের দাবী"র সব্যসাচী বলে অনেকে মনে করেন।

১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ হওয়ার কথা ছিল—ঐ দিন রাত্রে ৯০ নং পাঞ্জাবী দলের একজন ভারতীয় অফিসার জেলের ওয়ার্ডারদের এক কর্তার সঙ্গে এসে দেশবন্ধুকে বললেন—"আমরা জেলের ফটক খুলে দিচ্ছি, আপনারা স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যান। আর যদি বেরিয়ে গিয়ে ফোর্ট-উইলিয়াম দখল করতে চান,—তাও পারবেন। ফোর্টের ভারতীয় সিপাহীরা আপনাদের সাহায্য করবে।"—আমরা তো লাফিয়ে উঠলাম—একদিনের জন্য যদি ফোর্ট দখল করে মরি, ক্ষতি কি? কিন্তু দেশবন্ধু কিছুতেই রাজি হলেন না। জেলে থাকতে দেশবন্ধু নিজেকে civilly dead মনে করতেন—বাইরে গান্ধীজী ছিলেন, তিনি যা বলবেন তাই করায় তাঁর

মত ছিল। তাই প্রথম জেলে এসে হরতাল বন্ধ করার বিনিময়ে রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি ও রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্সের প্রস্তাব লর্ড রেডিং যখন করেছিলেন, তখন আলিভাইদের মুক্তি না দিলে মহাত্মা রাজি না হওয়ায়, তিনি জেলের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করতে করতে টেবিলে ঘুসি মেরে বলেছিলেন—"The whole thing has been bungled," কিন্তু বাহিরের নেতা গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে যাননি।

জেলে যাওয়ার আগে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম বরিশালে। সেখানে বি. পি. সি. সির মিটিং ছিল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মশায় ছিলেন সভাপতি। কিরণশঙ্কর বাবুর শ্যালক শ্রীযুক্ত অমিয় রায়চৌধুরীর বাড়ী আমরা অতিথি হয়েছিলাম। সেখানে দেশবন্ধু, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, উপেন বন্দোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর বাবু, সুভাষ ও আমি ছিলাম। মিটিং সম্বন্ধে শরৎদা "এটা সভা হচ্ছে না তামাসা হচ্ছে" এই কথা জিজ্ঞেস করায়—শ্যামবাবু চটে গিয়ে বললেন—"I can't stand your face, get out of this meeting." শরৎদা রেগে অমিয়বাবুর বাড়ী চলে এলেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে দেখি আফিংএর মৌতাত ক'রে তিনি বারান্দায় গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন! উপেনদাকে ডেকে বললেন—"ও আমায় আর যা' বলে বলুক, কিন্তু আমার মুখ তার সহ্য হয় না—ওকি আমার চেয়ে দেখতে এতই সুন্দর! যাই হৌক, উপিন,

তোমরা বোমা তৈরী করতে জানো, ঐ বেঁটে বামুনটাকে না মেরে ফেললে আমি আর অন্নজল গ্রহণ করবো না। আচ্ছা, তুমি একবার ফাঁসীর মুখ থেকে ফিরে এসেছ, তুমি জিনিষটা তৈরী করে দাও, সুভাষ মেরে আসুক, ওর তো গুরুমারা অভ্যাস আছে।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"না থাক, সুভাষের জীবনটা মূল্যবান, খুন করে ফাঁসী হলে দেশের ক্ষতি হবে; এই হেমন্তটা যাক্, ও মরলে কাঁদবার লোক নেই।

দেশবন্ধু সেই সময় মিটিং থেকে ফিরলেন—বললেন ব্যাপারখানা কি! শরৎদা আদ্যোপান্ত বিবরণ দিলেন এবং দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি তো বড় বড় খুনী আসামীকে খালাস করেছেন—চক্রবর্ত্তীকে মারাও হয় অথচ ফাঁসী হয় না—হেমন্তর সম্বন্ধে এমন একটা ব্যবস্থা করা যায় না? যা হোক ছেলেটা আমার কথা শুনে ফাঁসী যাবে এ কাজটা ভাল হবে না।" দেশবন্ধু হেসে বললেন—"আমি তো কোন উপায় দেখছি না, এরকম প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে খুন করলে হেমন্তর নির্ঘাৎ ফাঁসী হবে।" শরৎদা বললেন, "চক্কোত্তিকে মেরে কাপড়খানা খুলে নিয়ে বরিশালের নালার জলে হাত পা মেলে উপুড় করে ভাসিয়ে দিলে লোকে মনে করবে, একটা দাঁড়কাক ম'রে ভাসছে। দাঁড়কাক মারলে তো মানুষের ফাঁসী হয় না।" আধভরি আফিংএর ক্রিয়া তখনও সতেজে চলছে, আমরা হেসে

বাঁচি না। সুভাষচন্দ্র স্বভাবতঃ গম্ভীর হলেও আমাদের সে হাসিতে প্রাণ খুলে যোগ দিয়েছিল।

বরিশালে মিটিংএর কিছুদিন পরে মাণিকগঞ্জে, ঢাকা জেলা-কনফারেন্সে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষ ও আমি যাই। তেওতা রাজবাড়ীতে অতিথি হই। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুবাবু আমাদের বিশেষ আদর যত্ন করেন।

১৯২২ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনের রিলিফ অর্গানাইজ করে। এমন সুন্দরভাবে কাজ করেছিল যে তখনকার লাট লিটন সাহেবও তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি একদিন সুরেশদা, প্রফুল্লদা ও সুভাষকে নিয়ে শ্যামবাজারে "বিজলী" পত্রিকার আফিসে যাই। উপেনদা প্রভৃতি তখন সপরিবারে আফিসের উপরতলায় থাকতেন। "বিজলী"তে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা খুবই হ'তো। উপেনদা ১৩৫২ সালের মাঘ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে লিখেছেন—"একদিন সন্ধ্যার সময় দেখি বন্ধু হেমন্তকুমারের সঙ্গে তিনজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। ছেঁড়া মাদুরের উপরই তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে বসালাম। ক্রমে পরিচয় হলো। একজন হচ্ছেন ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ। গরীবের ছেলে; তবু মোটা মাইনের সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে জয় মা ব'লে অসহযোগ তরঙ্গে তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন।

অতি শান্ত ও বিনীত। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি হচ্ছেন—ক্যাপ্টেন সুরেশ ব্যানার্জ্জী। ডাক্তার মানুষ, প্রফুল্লবাবুর মতই সর্ব্ব-ত্যাগী। প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটি—ভদ্রলোক বলা মিছে; একেবারেই বাচ্ছা বললেই হয়। দিব্যি ফুট-ফুটে গৌরবর্ণ, ঠোঁটের ডগায় চাপা হাসি। মুখ চোখ উজ্জ্বল। বন্ধু হেমন্তকুমার পিছন থেকে চুপি চুপি বলে দিলেন ঐ সুভাষ।"

"ওঁরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে। কেন আমরা অসহযোগ আন্দোলনের খুঁত ধরি। কেন আমরা অহিংসার কথাটা শুনে বিদ্রূপ করি।

"সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে তর্ক চললো রাত একটা পর্য্যন্ত। অসহযোগের পক্ষ নিলেন প্রধানতঃ প্রফুল্লবাবু ও সুরেশবাবু। সুভাষ শুধু শুনছিল, আর মাঝে মাঝে হাসছিল। শেষে প্রফুল্লবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সারা দেশ যদি গভর্মেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়, তাহলে গভর্মেণ্ট ভেঙে পড়বে না কেন?

"আমি বললুম ভেঙে পড়বে না এই জন্য যে ইংরাজ আপনাদের মত অহিংস নয়। সে আপনাদের ক্ষেতের ধান লুঠ করে নিয়ে আপনাদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করবে। তখন হয় পুনর্মূষিক হতে হবে, নয়তো মারা পড়তে হবে। কোনদিকেই ইংরাজের ক্ষতি নেই।

"তর্কের ফল হল এই—আমাদের মতও তাঁরা মেনে নিলেন না, আমরাও তাঁদের মত মেনে নিলুম না। অনেক রাত হয়ে গেছে। যখন সভা ভঙ্গ হলো, তখন সুভাষ বললে আস্তে আস্তে—'দেখাই যাক দিন কতক! সত্যিই কি আর একেবারে অহিংস হয়ে গেছি!"

১৯২২।২৩ সালে আমি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে আমাদের একটা বইয়ের দোকানে বাস করতাম। এটার নাম ছিল—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব লিমিটেড—স্থাপিত ১৯২০। এই দোকানে রাজনীতির মস্ত বড় এক আড্ডা বসতো। বিপ্লবী শচীন সান্যাল, রাসিয়া থেকে অবনী মুখুয্যে এখানে গা-ঢাকা দিয়ে কিছুদিন থেকে গিয়েছিলেন। দেশবন্ধু প্রায়ই আসতেন; সুভাষ দৈনিক "বাংলার কথা" অফিস থেকে ফেরবার পথে আমাদের এখানে হয়ে যেতো এবং ষ্টোভ ধরিয়ে চা ক'রে দেশবন্ধু ও আমাদের সকলকে দিয়ে নিজে খেতো। চায়ের নেশা সুভাষের বিলক্ষণ ছিল—একদিনে ৩৪ কাপ চা খেতেও দেখেছি। চা পেলে আহার নিদ্রা ভুলে কাজ করতে পারতো।

বাজারের উপরে এরকম ষ্টোভ জ্বালা আইন সঙ্গত ছিল না—তাই মার্কেট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায় রোজ এসে ধম্‌কে যেতেন। ঘরের ভিতর দুটো আলমারির পিছনে চা করা হ'তো—তিনি দেখতে পেতেন না, কে চা করে আর কে চা খায়! পরে সুভাষ কর্পোরেশনের "চীফ" হয়ে মার্কেট ইন্‌স্‌পেকসানে আসে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টে আমাদের দেখিয়ে বলেন—"এই লোকগুলা একেবারেই কথা শোনে না স্যার,

কোন্‌দিন বাজারে আগুন লাগাবে। এত ক'রে বলি ষ্টোভ জ্বালা বন্ধ করতে তা কানেই তোলে না। আমি হাত জোড় করে বললাম, "স্যার আমরা নিরপরাধী, হুজুর নিজে জানেন কে চা করে ও কে চা খায়!" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ধমক দিয়ে বলেন "ইয়ারকি হ'চ্ছে?" এদিকে সুভাষ ঘন ঘন চোখ ইসারা করছে, হাসি চাপতে গিয়ে আমাদের পেট ফেঁপে উঠছে। সুভাষ তাড়াতাড়ি চলে গেল। একদিন যখন সুভাষ চা করছে আর দেশবন্ধু আমার শোয়ার ক্যাম্প খাটখানায় বসে আছেন —সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এনে দেখালাম। তিনি তো আমার হাতদুটি ধরে একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ। আমি বললাম —"কেন, আপনি নিজের কর্ত্তব্য করেছেন, তাতে দোষ কি? আমাদের চালচুলো নেই, আমাদের বাস আপনার মার্কেটের ছাতেই। কি করবো মাসে ৭৷৷০ টাকা বই বিক্রীর আয় থেকে নিজে ষ্টোভে রেঁধে না খেলে চলে না। তার পরদিন থেকে প্রায়ই আমাদের জন্য লুচী, পুরী, খাবার, ফল ইত্যাদি উপহার আসতো।

গয়া কংগ্রেস

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেস হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সুভাষ তাঁর সঙ্গে সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিল। উপেনদা প্রভৃতি আরও অনেকে গিয়েছিলেন। সভাপতির ক্যাম্পে এক বস্ত্রে সেই হাড়ভাঙ্গা শীতের মধ্যে গিয়ে উঠলাম। দেশবন্ধু তাঁর বহুমূল্য একটি গরম ওভারকোট দিলেন—সেটির সাহায্যে শীত কাটালাম। এই কোটটি এখনও স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ আমার কাছে আছে। রাতে সুভাষের কাছে শুয়ে কত গল্প করলাম। রাজাগোপালাচারি নো-চেঞ্জারদের নেতা হয়ে দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ১৭০০ঃ৯০০ আন্দাজ ভোটে জিতলেন। দেশবন্ধু বল্লেন ছয় মাসের মধ্যে আমি দেশকে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করাব। পরবৎসর অনুষ্ঠিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীর স্পেসাল কংগ্রেসে স্বরাজ্য দল কাউন্সিল প্রবেশের অনুমতি পান।

গয়া কংগ্রেসে ভারতে সর্ব্বপ্রথম সমাজতন্ত্রীদল গুপ্তভাবে গঠিত হয়। ফিজি থেকে ব্যারিষ্টার মণিলাল এসেছিলেন। বোম্বের শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এই দল সংগঠনে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিপ্লবী শচীন সান্যালের চেষ্টাতেই এই যোগা-

যোগ হয়। ডাঙ্গে বোম্বাই ফিরে "সোসিয়ালিষ্ট" নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় আমি নিয়মিত ভাবে লিখতাম। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে প্রকাশ্য ভাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে নাই। মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত শিঙ্গারুভেলু প্রথম এ আই. সি. সি. তে "কমরেড্" বলে সকলকে সম্বোধন করলে সেকি বিদ্রূপের উদ্রেক হয়েছিল, তা' এখনও আমার মনে আছে।

স্বরাজ্যদল

গয়া কংগ্রেস থেকে স্বরাজ্য দলের উৎপত্তি হয়। কলিকাতায় ফিরে তিনজন লোককে এই দলে পাওয়া গিয়েছিল। সে সুভাষ, কিরণবাবু আর আমি। ক্রমে দল পুষ্ট হ'তে লাগলো—কাউন্সিল ইলেক্‌সনের আগে সুভাষের তত্ত্বাবধানে "ফরোয়ার্ড" কাগজ বেরুলো। সুভাষের কর্ম্ম-নিষ্ঠা দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলকে একটি বিশেষ শক্তিশালী দল করে তুললো।

সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স ১৯২৪ সালে হয়। মৌলানা আকরাম খান সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন। এই কনফারেন্সে

দেশবন্ধু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সদলবলে গিয়েছিলেন। সুভাষ যেতে পারেনি—কাশীপুরের মেথর ষ্ট্রাইক নিয়ে বাধ্য হয়ে তাকে কলকাতায় থাকতে হয়েছিল। আমাকে দেশবন্ধুর সঙ্গে যেতে হ'য়েছিল। টেগার্ট সাহেবকে মারতে গিয়ে ডে নামে একজন সাহেবকে মেরে গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হ'য়েছিল। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথের প্রশংসা ক'রে আমরা এক মন্তব্য উপস্থাপিত করেছিলাম—প্রস্তাবটি বহুসংখ্যাধিক্যে পাশও হয়েছিলো। তাছাড়া সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট দাশ মশায় এই কনফারেন্সে পাশ করান। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিষয়ে কতকগুলি রেজোলিউসন প্রজার পক্ষে আমি পেশ করতে চাই। কিন্তু দেশবন্ধু আমাকে বারণ করেন। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আমি কনফারেন্স শেষ হওয়ার আগেই চ'লে আসি।

ফিরে ন'দে জেলার মেহেরপুর মহকুমায় একটা গ্রামে কৃষক-সমিতি কর্ত্তে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সুভাষের টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। সুভাষ একটী বিবৃতি সই করার জন্য আমাকে দেখালো। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে যে মন্তব্যটীর খসড়া আমি নিজে হাতে করেছিলাম, দেখলাম এটী তা থেকে ভিন্ন। তখনকার ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি ভিলিয়ার্স সাহেব নাকি দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লেছেন, যে গোপীনাথ সম্বন্ধে প্রসংশাসূচক মন্তব্যটা একটু নরম করলেই, লাট-লিটন Devolution rules Govt. of India Act অনুসারে শাসন ক্ষমতা স্বরাজ্যদলের

হাতে দেবেন। দেশবন্ধু এমন লোককে দিয়ে বিবৃতিটাতে আমার সই করালেন যার কাছে 'না' বলতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কেবল সই করার আগে একবার সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বলছো এটা সই করতে? সুভাষ নির্বিকার চিত্তে বললো—হ্যাঁ। আমি সই ক'রে দিলাম। কাগজে বিবৃতিটা বেরুলে "ষ্টেটস্‌ম্যান" সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেন, এটা মূল মন্তব্য নয়, তার কপি তাঁরা আমার হাত থেকে পেয়েছিলেন! তখনও প্রফেসারির গন্ধ গায়ে একটু একটু আছে, পরিবর্ত্তিত বিবৃতি সই করে, সুভাষ করতে বললো দেখে, আমার আর ক'দিন ঘুম হয়নি।

এদিকে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের কপি নেতাদের সই দিয়ে বেরুলো—আমার এবং সুভাষের নামও তাতে ছিল, আমরা নিজে সই করিনি বা সই করতে মতও দিইনি। সুভাষ ও আমি আস্তিন গুটিয়ে ১৪৮নং রসা রোডে দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের নাম কেন দেওয়া হয়েছে। দেশবন্ধু একটা কাণে একটু কম শুনতেন—সেই কাণটা বাড়িয়ে শোনবার ভান করলেন এবং অনেকক্ষণ আপনমনে চুপ ক'রে কাজ ক'রে যেতে লাগলেন, আমরা অপেক্ষা ক'রে চ'লে আসছি, তিনি দেখতে পেয়ে একটুখানি হেসে বললেন—তোমাদের নাম সই ক'রে দিতে আমাকে আবার অনুমতি নিতে হবে? আমরা ফিরে এসে বসলাম।

আনন্দবাজারের রসিকতা

এই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় আমাদের দলকে

বিদ্রূপ ক'রে একটা লেখা বেরিয়েছিলো—সেটা উদ্ধৃত করলাম :— ৪ঠা শ্রাবণ (20th July, 1924)

রং বেরং

রিপোর্টার—নন্দীভৃঙ্গী

[স্থান, শ্রীধাম শ্রীভবানীপুর—সময় সন্ধ্যা,—বৈঠকখানায় প্রতাপিত কুঞ্জ, ঢাকেশ্বরী, বসন্তসেনা, মেদিনীময়ী, হেমন্তকুমারী, অনিলবরণী, চন্দ্রা, শৈলেশা, কৃষ্ণস্থূলা, গৌরকৃশা প্রভৃতি সখীবৃন্দা সন্ধ্যাবেলা লীলাময়ের মিলন আশায় উৎকণ্ঠিতা। শ্রীমন্দিরের দ্বার এখনো খোলে নাই। বিরহাতুরা সখীবৃন্দা চা পান করছিলেন, এমন সময় বিগলিত খদ্দরাঞ্চলা, লোচন-চঞ্চলা, ভয়ত্রস্তা সখী সুভাষিণীর সচকিত প্রবেশ।]

সুভাষিণী—কৈ লীলাময় কৈ? আমার সকল লজ্জা-নিবারণ তিনি কোথায়? সহচরী ঢাকেশ্বরী চ'লো, শীগগীর খবর দে, আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিনা!

সকলে—কি হলো, কি হলো—ধনী আজ উন্মাদিনী কেন?

সুভাষিণী—সোমত্ত বয়েস—সকলেই নজর দেয় গো—নজ্জায় মরে যাই গো, নজ্জায় মরে যাই। সকাল বেলায় দেখি, অমৃতবাজারের গোলাপ বুড়ো আর বেঙ্গলীর বিপ্‌নে বুড়ো কট্‌মট্ করে চেয়ে আছে—গায়ে কাঁটা দেয় গো—নজ্জায় মরি। এমন কাঁচা বয়সে দশের মন জুগিয়ে চলতে

পারব না! এই তিনির পায়ে প্রাণ সঁপেছি, তিনি যা' বলবেন তাই করবো। একথা বলে কি অন্যায় করেছি, তোমরাই বল দেখি সখি!

অনিলবরণী (ভাবস্থ হইয়া)—সখি, কর্পোরেশানী কুঞ্জের চন্দ্রাবলী, স্বয়ং লীলাময়, মেয়ররূপে যাঁর কুঞ্জে গিয়ে রসের সাধন করেন, তাঁর সিদ্ধি যে নিকটবর্ত্তী হয়েছে, আমি তা ভাবেই বুঝেছি। তোর প্রেম পেকেছে লো পেকেছে। লোক নিন্দা, গুরুগঞ্জনা, ও তো হবেই—ঐতো প্রেম সাধনার হারাঠাঁই দেখিয়ে দেবার ইঙ্গিত। আহাহা, এসব রসের কথা -রসিকরাই জানেন। আহা দ্বাপরে যা' হয়েছিল, কলিতে লীলাময় নবরূপে তাই দেখাচ্ছেন। তিনি যে বলেন, লীলা অনন্ত, ইতি করবি কি করে ভাই?"

সুভাষিণী—না না আমি আর পারিনে ভাই। তোরা কি লিখেছিলি মেদিনীময়ী—তা' আমি ত তাঁর আজ্ঞায় সইটেই দস্তখত করে দিলুম। আর তাই নিয়ে এত জ্বালা। সিভিলিয়ান কুলত্যাগ করে কি শেষে এই অপবাদ কপালে লেখা ছিল।

বসন্তসেনা—স্বরাজ রঙ্গিনী মোরা, উগ্রচণ্ডা সখি,
মোরা কি ডরাই সখি ভিখারী বিপিনে?
অসহযোগীর মুণ্ডে খেলেছি গেণ্ডুয়া
সিরাজগঞ্জে হিন্দুসভা লণ্ডভণ্ড করি
দেখায়েছি স্বরাজী প্রতাপ! দেহ আজ্ঞা—
মির্জ্জাপুর গোলদীঘি বিকম্পিত করি

কহি দিব জনে জনে. হিংসুক সংবাদপত্র
দায়িত্ব বিহীন, মিথ্যাবাদী, খায় ঘুষ,
সুভাষিণী অনুগ্রহে হইয়া বঞ্চিত,
চাকুরীর ছল ধরি দেয় গালাগালি।
অতএব সবে মিলি কর বয়কট
সমস্ত কাগজ, শুধু পড় "ফরওয়ার্ড" ;
বুঝিবে লীলার তত্ত্ব! হুঙ্কার দাপটে
করতালি দিবে বঙ্গজন দন্ত বিকশিয়া,
সুভাষিণী জয়নাদে পূরিবে আকাশ।

(লীলাময়ের প্রবেশ)

লীলাময়—কিসের গর্জ্জন-ধ্বনি, অনুমানি' অমঙ্গল ঘটনাই কিছু! (বড় একখানা সোফায় লীলাময় বসলেন, পাশেই লুটিয়ে পড়ল লাজারুণবরণী সখী সুভাষিণী!)

সুভাষিণী—আর যে পারি না লীলাময় বিশ্বাস ধরে রাখতে! কর্পোরেশানী-কুঞ্জের চাকর করবার তুমি যাদের হুকুম দিয়েছিলে, তা নিয়ে সবাই যে আমার নিন্দা করছে। বলছে—

লীলাময়—শুনতে চাই না। সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে নিজেকে লীলার যন্ত্র করতে তুমি এখনো পারনি? এবারের ইতিহাসের এই ইঙ্গিতকে তুমি যৌবন জীবন দিয়ে গ্রহণ করনি? এ লীলা বহিরঙ্গ লোকে এর কি বুঝবে? মান অভিমান আমিত্ব এসব থাকলে তো স্বরাজ-বৈকুণ্ঠ আসবে না। সব কুণ্ঠা ছাড়তে হবে। সব রকম কাজ অকুণ্ঠ চিত্তে করলেই তোমার স্বরাজ-বৈকুণ্ঠ লাভ হবে।

সখীবৃন্দ—আহাহা, কি আলোই পাচ্ছি, একটা কথা যেন, শিবচুনীর সলৃতের মত জ্বল জ্বল করে ওঠে।

লীলাময়—ওগো নদীয়া নাগরী, নদীয়ার কুশল তো? লীলা কেমন চলছে?

হেমন্তকুমারী—(মিহিস্বুরে) আনছি, প্রভু ঠিক করে আনছি, কেবল মুড়োগাছায় এক গয়লা গোলমাল করছে!

ঢাকেশ্বরী—সখি সুভাষিণী, ইয়াতেই তুমি ধৈর্য্য হারাও ক্যান। * * * পুতিরা আমার নামে কত কথা কইছে; তাতে আমার কি গায়ের চামরা গেছে না লীলায় ক্ষান্ত দিছি। আমি তোমারে বারে বারে কইছি, আমি হক্কল ঠিক্ কইরা চালাইমু—তুমি শান্ত থাইকো! চাকরী করবা? তা' কাউন্সিলের মেম্বরগরে কুটুম্ব হইবার পার নাই! ভোট পাইমু, চাকরী দিমু—এ আমাগো সোজা কথা! চইটা কি করবা—ঘরের ভাত খাইবা, আর খবরের কাগজে লেখফ্যা, তবে তো—আমরা বাসায় যাইয়া মইরা থাকুম আর কি?

সুভাষিণী—লীলাময়, আমার চিত্ত যে শান্ত হচ্ছে না! হায় সখী মেদিনীময়ীকে নিরাশ করে কর্পোরেশনী-কুঞ্জে যাওয়ার পাপের ফলে কি আমার এই দুর্গতি!

লীলাময়—ধৈর্য্য ধর সুভাষিণী,—শোন সখিগণ,

স্বরাজী লীলার এই প্রথম সন্ধ্যায়
হারায়ো না লীলায় বিশ্বাস। দীর্ঘরাত্রি
আছে; কংগ্রেস কাউন্সিল আছে, আছয়ে
খিলাফ;—নবলীলা হবে প্রকটিত।

শুধু সুভাষিণী নয়, জনে জনে পাইবে
চাকরী। আপাততঃ ভাতা আর গাড়ীভাড়া নিয়ে
থাকহ সন্তুষ্ট।

সখীবৃন্দ—সেই আশাতেই আছি প্রভু, সেই আশাতেই আছি!

(ইতি যবনিকা পতন)

স্বরাজ্যদলের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মিটিং হল—কে কে মন্ত্রী হবে ও কে কে সেক্রেটারি হবে আলোচনা হ'ল। সুভাষ ও আমি ঠিক করলাম— বয়োবৃদ্ধেরা মন্ত্রীত্ব করুক, আমরা বিরোধী দলে থাকবো। দেশবন্ধু আমায় অন্য কোনও পদ না দিয়ে বললেন—ও আমার সেক্রেটারী থাকবে, আমার জন্যই ওর বিলাত যাওয়া হয়নি, রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্সে আমার সঙ্গে বিলাত যাবে।

সুভাষ কর্পোরেশন নিয়ে ব্যস্ত। স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল প্রবেশের সময় সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করলেও, নিজে কাউন্সিলে যাওয়াটা পছন্দ করতো না। আমার ইলেক্‌সনের সময় সে নিজে তার মেজবৌদির কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে দিয়েছিল, এবং নদীয়া গিয়ে মিটিং করেছিল। দেশবন্ধু ও তার চেষ্টাতেই আমার মত সামান্য লোক প্রবল প্রতিপক্ষ একজন ধনী জমিদারকে পরাস্ত করে নির্ব্বাচিত হতে পেরেছিল। আমার জন্য মাত্র শো আষ্টেক টাকা খরচ হ'য়েছিল, প্রতিপক্ষের নাকি প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং তিনি আমার ভোটসংখ্যার আধাআধি রকম পেয়েছিলেন।

সুভাষকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে কাউন্সিলে নিয়ে গিয়েছিলাম, খানিকক্ষণ থেকে সে চ'লে আসে।

কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

কলিকাতা
১০।৫।২৪

হেমন্ত,

আমি বুঝতে পারলামনা। কাউনসিলের সঙ্গে কর্পোরেশনের ও মন্ত্রীদের সঙ্গে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের তুলনা তুমি কেমন করে করলে? প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে আমরা ধ্বংসের পক্ষপাতী, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী। মন্ত্রীদের বেতন না-মঞ্জুর করা হয়েছে ধ্বংস মূলক কার্য্যের নীতিতে, তাদের গুণাগুণ দিয়ে নয়। গুণবিচার করলে মন্ত্রীদের বেতন ১৫০০৲ বা ১০০০৲ টাকা ধার্য্য করা হত। আমার মতে এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাইনে ১০০০৲ টাকা হওয়া উচিত, কিন্তু পার্টিতে আমাদের মত গৃহীত হয় নাই, এবং ১৫০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য হয়।

আমি কি বলেছি যে দেড়হাজার টাকা আমি নিজের জন্য নেবো? আমি নিজের জন্য কতটা রাখব এখনও স্থির করিনি।

অবশ্য তোমার মত ছিল আমার এই পদগ্রহণ করা উচিত হয়নি। আমি সিভিল সার্ভিস পাশ করার সময় যে কথা লিখেছিলে তা' তোমার মনে আছে।

সে যাই হউক, আমি তোমার নদীয়ার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করি। কিন্তু তুমি কি ভোটার? আশা করি তুমি ভাল আছ। ইতি—

সুভাষ

১৯২৪-৪০

হঠাৎ একদিন দলের অনেকের সঙ্গে সুভাষ গ্রেপ্তার হ'ল। সেটা ২১শে অক্টোবর ১৯২৪ সাল। ১৯২৭ সালের জুন মাসে সুভাষ ছাড়া পেল। এই সময় থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত সুভাষের কার্য্যাবলীর কথা সকলেই জানেন। সেজন্য বাহুল্য ভয়ে তার উল্লেখ করলাম না।

১৯৪০ সালে আমি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে দমদম্ জেলে থাকতে সুভাষ জামিন অবস্থায় বাড়ী থেকে উধাও হয়। তারপর আলিপুর জেলে চিকিৎসার জন্য আমি বদলি হই। সুভাষের ভ্রাতুপুত্র দ্বিজেন এই জেলে আসে—তার কাছে সুভাষের পলায়ন কাহিনী সমস্ত শুনলাম। সহকর্ম্মীদের অর্থের দাবী না মেটাতে পেরে সুভাষ শেষ পর্য্যন্ত চোখের জল ফেলে দেশত্যগ করেছে, শুনে দুঃখ হ'ল। আমি জেলহাসপাতালে ছিলাম—কিছুদিন পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম. এল. এ. এলেন আলিপুর জেলে। সুভাষ প্রেসিডেন্সিজেলে থাকতে একজন সঙ্গী চাওয়ায় জেলকর্তৃপক্ষ নরেন বাবুকে তাঁর সঙ্গে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, মশায় সুভাষবাবুর আপনার জন্য এত দরদ তা জানতাম না। পালাবার আগে প্রেসিডেনসি জেলে থাকতে কতরাত পর্য্যন্ত আপনার কথা বলতেন, আর চোখের জলে ভাসতেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয় ঘটলে, সুভাষ নাকি জাপান যাওয়ার পথে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমরা শুনেছি সুভাষ বেঁচে আছে, এই সান্ত্বনা নিয়েই আমরা চেয়ে আছি কবে আবার সুভাষ ফিরে আসবে এবং দেশের এ দুর্দিনের অবসান ঘটাবে।